তারাপদ রায়

SUPERIOR SUNY

কখগঘ

BOILOVERS.COM

আবার তারাপদ রায়। আবারও রঙ্গগল্পের অফুরান তরঙ্গ। সে-তরঙ্গে কখনও অবগাহন, কখনও ভেসে-চলা। কাণ্ডজ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞানগম্যি, বুদ্ধিশুদ্ধি, শোধবোধ-এর মিছিলে এবার কখগঘ। নাম বদলেছে, কিন্তু চরিত্র অভিন্ন। সেই মজলিশী মেজাজ, সেই পত্রে-পত্রে সরসতা, সেই ছত্রে-ছত্রে কৌতুক।

●

তারাপদ রায়ের রঙ্গকৌতুকধর্মী রচনা মানেই বিশুদ্ধ আড্ডার এক ফুরফুরে পরিবেশে উদার আমন্ত্রণ। আড্ডায় যেমন বিষয়ের কোনও পারম্পর্য থাকে না, এক প্রসঙ্গ থেকে এসে পড়ে হাজারও প্রসঙ্গ, তারাপদ রায়ের এই লঘু নিবন্ধমালার বইগুলিতেও তেমনই বিষয় থেকে বিষয়ান্তর নিয়ে জমে ওঠে মজলিশ। যেমন এই 'কখগঘ' বইটিতে। বাজারদর থেকে বিশ্বকাপ, চার্চিল থেকে বইচুরি, প্রেম থেকে পঞ্জিকা, দাম্পত্য জীবন থেকে কান্তকবি, চোর থেকে চিনে রঙ্গ—এমন অজস্র বিষয় নিয়ে একের পর এক খোশগল্প। প্রতিটি মজার, প্রতিটি অব্যর্থ। সেই সঙ্গে তারাপদ রায়ের অজস্র বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, স্বাদু, সরস আলোচনাভঙ্গি।

প্রচ্ছদ দেবাশিষ দেব

আনন্দ পেপারব্যাক
র ম্য র চ না
মূল্য ৩৫·০০

9 788172 155087

ক খ গ ঘ

তারাপদ রায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

আ ন ন্দ পে পা র ব্যা ক

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৬

© মিনতি রায়

ISBN 81-7215-508-5

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

গ্রন্থটি এই শর্ত সাপেক্ষে বিক্রি করা হল যে, প্রকাশকের লিখিত পূর্ব-সম্মতি ছাড়া যে-আকারে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার অন্যরূপ বাঁধাই বা প্রচ্ছদে এবং অনুরূপ ধরন ব্যতিরেকে অন্য কোনো পদ্ধতিতে ব্যবসা-সূত্রে বা অন্যভাবে এই গ্রন্থ ধার দেওয়া, পুনরায় বিক্রি করা, ভাড়া দেওয়া বা অন্যভাবে প্রচার করা যাবে না। সেই সঙ্গে উপরোক্ত সংরক্ষিত কপিরাইট অধীন অধিকারকে সীমায়িত না-করে পরবর্তী ক্রেতার উপর এই শর্তও আরোপ করা হচ্ছে যে, এই গ্রন্থের কপিরাইটের মালিক এবং উপরোক্ত প্রকাশক, উভয়েরই লিখিত পূর্ব-অনুমতি ছাড়া যে-কোনো পদ্ধতিতে বা যে-কোনো উপায়ে (ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক, মেকানিক্যাল ফোটোকপিয়িং বা অন্যভাবে) এই প্রকাশনার কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ, মজুত অথবা কোনো পুনরুদ্ধার (রিট্রিভাল) পদ্ধতিতে উপস্থাপন বা প্রেরণ করা যাবে না।

শ্যামল দত্তচৌধুরী
করকমলেষু

BoiLovers.com
Present

Book is free for all

Contact

www.boilovers.com

www.facebook.com/SuperiorSuny

01843-456129

NEED DONATION

CAN DONATE

BOILOVER.COM

IF YOU WANT

Donate on

01843-456129

সূচিপত্র

হায় ভীরু প্রেম ৯
মাতালের গল্প ১৬
বাজার ১৮
মনের কথা ২১
চিনা-অচিনা ২৫
কয়েকটি অবিশ্বাস্য রসিকতা ২৮
শিশুপাল বধ ৩০
লা জবাব ৩৬
চোর ৪২
বই ও বইমেলা ৪৪
মনের চিকিৎসা ৪৭
হারানো প্রাপ্তি ৫০
বিবিধার্থ সংগ্রহ ৫২
বিশ্বকাপ বনাম নিঃস্বকাপ ৫৪
কান্তকবি ৫৮
জ্যোতিষী ৬০
আবার জ্যোতিষী ৬২
পথের ভিখিরি ৬৫
বিয়েটিয়ে ৬৭
পঞ্চাশ-পঞ্চাশ ৭০
বালখিল্য ৭২
বেআইনি ৭৫
গুরু-শিষ্য সংবাদ ৭৮
ভুলোমন স্বামী ৮৪
চোর চোর ৮৬
শরীর ও স্বাস্থ্য ৮৯
বই চুরি ৯১
কৃপণ ৯৩
ফিলমি ৯৬
ফিলমি-ফিলমি ৯৮
চার্চিল ১০১
ভয়াবহ ১০৩
পঞ্জিকা ১০৫
স্থূল-অস্থূল ১০৯
নিমন্ত্রণ ১১১
মাছ ১১৪
জানোয়ার ১১৬
তুমি যে আমার ১১৯
স্ত্রী রত্ন ১২১
সৈয়দ মুজতবা আলী ১২৪

হায় ভীরু প্রেম

ভালবাসা নাকি চাঁদের মতো। কখনও এক অবস্থায় থাকে না। হয় বাড়ে না হয় কমে। চন্দ্রকলার মতো হয় প্রেম ক্রম বিকশিত হয় নতুবা ক্রম বিনাশিত হয়।

জানি এ-সব ছেঁদো দার্শনিক তত্ত্ব এই হালকা হাসির লঘু নিবন্ধে আর যাই হোক তারাপদ রায়ের কাছে কেউ আশা করেন না। সুতরাং আপাতত তরল কাহিনীর স্রোতে কিছুটা এগোনো যাক। ধরা যাক সেই প্রেমিক-প্রেমিকার কথা যাঁরা দীর্ঘ প্রেমলীলার পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তার পরে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদের দু'জনের মধ্যে কোথাও কোনও বিষয়ে সামান্যতম মিল নেই। শুধু একটা জায়গায় মিল ছিল দু-জনের, দু-জনারই বিয়ের তারিখ এক, তা ছাড়া দু-জনারই একই ম্যারেজ রেজিস্ট্রার।

এ গল্পটা আসলে সেই পুরনো গল্পটার মতো যেখানে গল্পের নায়ক দুঃখ করে বলেছিলেন 'আমাদের বাড়িতে আজ পর্যন্ত কারও ভাল বিয়ে হয়নি একমাত্র আমার স্ত্রী ছাড়া।' স্বামী-স্ত্রীর প্রসঙ্গে যথাস্থানে আসা যাবে, এখন প্রেমিক-প্রেমিকার ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

অনেকদিন আগে একটি ছেলে আমাকে বলেছিল যে, তার যে প্রেমিকা সেই মেয়েটি যমজ সন্তানের একজন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দু-জনার মধ্যে ঠিক কোনজন তোমার প্রেমিকা বুঝতে তোমার কোনও অসুবিধা হয় না ?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে আমাকে জানিয়েছিল, আরে না, না দাদা, অসুবিধে হবে কেন ? ওর ভাইয়ের একটা গোঁফ আছে যে। এই রকম অন্য একটি ক্ষেত্রে আমি নিজে যে জবাবটা দিয়েছিলাম সেটাও এই সূত্রে স্মরণীয়। সে অনেককাল আগের কথা। জনৈক ভদ্রলোক

আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার স্ত্রী এবং শ্যালিকা দু-জনেই তো এক রকম দেখতে, কে আপনার স্ত্রী, কে আপনার শ্যালিকা চটপট বুঝতে অসুবিধে হয় না আপনার ?

যাঁরা বিদ্যাবুদ্ধি পড়েছেন তাঁরা জানেন আমি কী বলেছিলাম, আমি বলেছিলাম, বোঝার খুব চেষ্টা করি না।

সেই কবে পবিত্র বাইবেলে লেখা হয়েছিল ভালবাসা মৃত্যুর মতোই শক্তিশালী। এই বাইবেল-বাক্য স্মরণে রেখেই বোধহয় একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে এক আবেগবিহ্বল মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা আমি যদি হঠাৎ মরে যাই তা হলে তুমি খুব দুঃখ পাবে ?

প্রেমিকের এই শিশুসুলভ প্রশ্নে খুবই কৌতুক বোধ করেছিল যুবতীটি কিন্তু মুখে বলেছিল, 'নিশ্চয়'।

এর পর প্রেমিক জানতে চেয়েছিল, তুমি খুব কাঁদবে ?

প্রেমিকা বলেছিল, কাঁদব না কেন ?

তখন সেই প্রেমিক অন্যায় আবদার করে বসল, একটু কেঁদে দেখাও না।

এই অনুরোধ রক্ষা করার বদলে একটি অতি নিষ্ঠুর জবাব দিয়েছিল যুবতীটি, একটু মরে দেখাও না।

জানি না, এর পরেও ভালবাসা মৃত্যুর মতো শক্তিশালী ছিল কিনা, এর পরেও টিকেছিল কিনা।

প্রেম ও মৃত্যুর ব্যাপারে সেই ঘটনাটাও মনে পড়ছে। প্রেম নিবেদন করার পরে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে খুবই ভেঙে পড়েছিল সেই প্রেমিক। শুধু প্রণয় নিবেদন নয়, সে কিন্তু পরিণয় প্রস্তাবও দিয়েছিল। মেয়েটি রাজি না হওয়ায় সে বেচারা একেবারে মুষড়িয়ে যায়, প্রায় কান্নাকাটি করে আর কী।

মেয়েটি তখন সমবেদনার সুরে জিজ্ঞাসা করল, কী হল তোমার ? এত ভেঙে পড়লে কেন, শেষে আত্মহত্যা করবে নাকি ?

ছেলেটি বলল, এ-সব ক্ষেত্রে আমি সাধারণত আত্মহত্যাই করে থাকি।

অন্য এক ঘটনায় এক বাক্যবাগীশ প্রেমিক তার দয়িতাকে বড় গলায় বলেছিল, আমি দরকার হলে মৃত্যুর সামনেও দাঁড়াতে পারি। ভালবাসার কথা চলছিল এক পার্কের পাশের বেঞ্চিতে বসে। এমন সময় পার্কের ভিতরে ভারী একটা শোরগোল উঠল। সবাই যে যেদিকে পারে ছুটতে লাগল। একটু পরেই বোঝা গেল ব্যাপারটা, দূরে দেখা গেল শিং উঁচিয়ে একটা বিরাট পাগলা ষাঁড় ছুটে আসছে।

প্রেমিক-প্রেমিকা যে বেঞ্চিতে বসে ছিল দেখা গেল ফোঁস ফোঁস করতে করতে সেই দিকেই ষাঁড়টা ছুটে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে উঠে শ্রীযুক্ত প্রেমিক আর্তচিৎকার দিয়ে এক লাফে পার্কের রেলিং পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ে ছুট লাগাল। এদিকে প্রেমিকের এই আর্তচিৎকার শুনে এবং দীর্ঘ লম্ফ দেখেই বোধহয় ষাঁড়টি গতিপথ বদল করে অন্য দিকে ধাবমান হল।

একটু পরে ষাঁড়টি যে রকম ভীমবেগে এসেছিল ঠিক সেভাবেই পার্কের খোলা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। নিরাপদ দূরত্ব থেকে শ্রীযুক্ত প্রেমিক এর পরে গুটিগুটি প্রেমিকার কাছে ফিরে এল।

ভালবাসার মানুষের এই কাপুরুষতা দেখে প্রেমিকাটি তখন রীতিমতো উত্তেজিতা। প্রেমিক সামনে আসতেই তাকে চেপে ধরল, এইমাত্র তুমিই না বলেছিলে আমার জন্যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারো আর একটা ষাঁড় দেখেই আমাকে ফেলে ছুটে পালালে। শ্রীযুক্ত প্রেমিক মাথা চুলকিয়ে বলল, কী করব বলো, ষাঁড়টা যে মৃত ছিল না।

শুধু ষাঁড় দেখেই যে প্রেমিকেরা পলায়নপর হয় তা কিন্তু নয়। কমলার বাবা কমলাকে বলেছিলেন, ওই যে অমিত না অসিত কী নাম যেন ছেলেটির, ওই যে ছেলেটি তোমার লাভার, ওর সঙ্গে আর কোনওদিন তোমার দেখা হবে না।

এই শুনে কমলা ডুকরে কেঁদে উঠল, কী করেছ তুমি তার, বলো কী করেছ ?

কমলার বাবা বললেন, আমি তার কী করব, কিছুই করিনি। সে আমার কাছে একশো টাকা ধার চেয়েছিল, সেই টাকাটা তাকে দিয়েছি।

টাকা-পয়সার ব্যাপার আরও আছে।

জয়ন্তীর সঙ্গে জয়ন্তর নতুন আলাপ।

দু'জনে গলির মোড়ে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফুচকা খাচ্ছিল। হঠাৎ জয়ন্তের মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তাই দেখে জয়ন্তী জানতে চাইল, কী ব্যাপার জয়ন্তদা, কী হল আপনার ?

জয়ন্ত বলল, ওই যে পটল না কী যেন নাম, তোমার সেই বিচ্ছু ভাইটা—আমাদের ফুচকা খেতে দেখে ফেলেছে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে জয়ন্তী বলল, কই, কোথাও তো পটলাকে দেখতে পাচ্ছি না। আপনি নিশ্চয় ভুল দেখেছেন জয়ন্তদা।

জয়ন্ত বলল, ওই দেখো সামনের ফুটপাতের ল্যাম্পপোস্টের

পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

জয়ন্তী ভাল করে দেখে বলল, এ তো পটলা নয়। ও হল ছেণ্টু, আমার খুড়তুতো ভাই।

জয়ন্ত বলল, তাতে কিছু সুবিধে হচ্ছে ?

জয়ন্তী বলল, খুবই সুবিধে। এ-সব জায়গায় পটলা পঞ্চাশ টাকার কমে ছাড়ে না। ছেণ্টুটা বোকাসোকা ভালমানুষ, ওকে আপনার বিশ টাকা দিলেই হবে।

এই জয়ন্ত-জয়ন্তীর বিয়েতে প্রতিবেশী হিসেবে আমি নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম। তারা দু'জনেই এখন সুখী দম্পতি। পটলার মাঝে মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

আমি নিজে এক প্রাচীন পাপী, দীর্ঘদিন আগে সেই কবে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয়েছিলাম। প্রেমিক-প্রেমিকার কাহিনী লিখতে গিয়ে আমি বার বার দাম্পত্য কাহিনীতে চলে যাচ্ছি। কিন্তু চৌকস লোকেরা বলেন দাম্পত্য-প্রেম প্রেম নয়, বৈষ্ণব কবির সেই রজকিনী প্রেমের মতো নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়। এতে অবশ্য আমারই সুবিধে, সবাই জানেন, কাজকর্মে আমার তেমন ফুর্তি নেই। মদালসা নবীনা পাঠিকা হয়তো একটু দুঃখিত হবেন, কিন্তু এ বয়েসে, যখন তিনকাল গিয়ে এক্কালে ঠেকার বয়েসে প্রায় এসে গেছি, আমি একটু ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে চাই। প্রেমবিষয়ক দুটি অধরা, অছোঁয়া গল্প বলি।

এক নৈশ সমাহারে একটি পরমা সুন্দরী কন্যা সকলের দৃষ্টি বাঁচিয়ে ঘরের এক প্রান্তে একটা পাতাবাহারের টবের পাশে দাঁড়িয়ে। সেখানেও এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, তাঁর কৌতূহলও কম নয়, তিনি জানতে চাইলেন, তুমি ওই হলের মধ্যে হই-চই হাসি-তামাসা থেকে এখানে চলে এলে কেন ?

মেয়েটি বলল, আরে পুরুষমানুষগুলো, বেঁটে-লম্বা রোগা-মোটা, কালো-ফর্সা, যুবক-বুড়ো সবাই আমাকে বিরক্ত করছে, খালি জানতে চাইছে, আমি থাকি কোথায় ? বর্তমান ভদ্রলোক এবার সুন্দরীকে আপাদমস্তক ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, তা তুমি জবাবে কী বললে ? খুব ছোট একটা হাই চাঁপার কলির মতো আঙুলের তুড়ি দিয়ে নিবৃত্ত করে সুন্দরী বলল, কী আর বলব ? বললাম যে আমি শহরতলিতে থাকি।

মুখে তুড়ি দেওয়ার সময় সুন্দরী যে দেহবিভঙ্গ রচনা করেছিল বর্তমান ভদ্রলোক তার পর স্ট্যাচু হয়ে গিয়েছিলেন, এবার খুবই

আমতা আমতা করে বললেন, কিন্তু সত্যি তুমি থাকো কোথায় ?

এবার সুন্দরী নয়নধনুকে শর সংযোজন করে বলল,ওই তো বললাম না, আমি তো শহরতলিতে থাকি।

এই রকমই অধরা গল্প অন্য একটা। কোথা থেকে টুকে যেন লিখেছিলাম, এখন গ্রন্থস্থ অবস্থায় শোধবোধে আছে। নিজের কাছে নিজেই অনুমতি নিয়ে গল্পটি আবার বলছি। ...পার্টিতে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে, হা-প্রেম লোকেরা তাকে দেখে অভিভূত হয়ে যেত। তার ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করত।

একদা এক উদভ্রান্ত, প্রেমপাগল যুবক সেই যুবতীকে এক আসরে পেয়ে আর কিছুতেই কাছ ছাড়া করছে না। তার চোখে গদগদ দৃষ্টি, তার কণ্ঠে ভালবাসার মধু। কিন্তু মেয়েটির সে কিছুতেই পাত্তা পেল না। কতবার অনুরোধ করল, জানতে চাইল, আপনি কী একা এসেছেন, আপনি কী করে ফিরবেন, আমি আপনাকে নামিয়ে দেব, মেয়েটি হ্যাঁ, না, থ্যাঙ্ক ইউ ইত্যাদি টুকটাক সংক্ষিপ্ত জবাবে পাশ কাটিয়ে গেল।

অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে যুবকটি বলল, আপনার ফোন নম্বরটা যদি দেন, কোনওদিন যদি ফোন করি।

মেয়েটি বলল, টেলিফোন ডিরেক্টরিতে পাবেন।

অতঃপর মরিয়া হয়ে যুবকটি শেষতম মোক্ষম প্রশ্নটি করল, কিন্তু আপনার নাম।

মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, সে-ও ওই টেলিফোন ডিরেক্টরির মধ্যে পাবেন।

মেয়েরা যে সহজে পাত্তা দিতে চায় না, অনায়াসেই প্রত্যাখ্যান করে এ তো সকলেরই জানা কথা।

অল্প বয়েসে আমার এক সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন, প্রেম পারাপারে ঝাঁপিয়ে দেখুন অনেক মেয়েই আপনার সঙ্গে সাঁতরাতে রাজি হবেন, অনেকটা দূর সাঁতরাবেন, কিন্তু কিছুতেই তীরে উঠে ঘর বাঁধতে চাইবেন না।

আমি একটু বোকার মতো বলেছিলাম, মানে ?

সহকর্মী করুণ হেসে বলেছিলেন, মানে আর কী ? বহু মেয়ে আছে যারা বিয়ে করতে চায় না।

আমি বললাম, জানলেন কী করে ?

কী করে আর, সহকর্মী বললেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। আমি যে অনেককেই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দেখেছি।

আমার এই সহকর্মী বন্ধুটির মতো অভিজ্ঞতা নিশ্চয় অনেকেরই আছে। তবে আমার নেই। কোনওদিন কোনও মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার এমন কী তার প্রেমে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। এতদিন পরে এ নিয়ে কোনও আফসোসও নেই আমার। যাক সে সব অন্য কথা। এই বার কাহিনীমালার বিরতি টানতে হয়। তবে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, শেষ গল্পটি বড়ই মর্মান্তিক।

বলরাম বনলতাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলল, দেখো, হয়তো আমি বলহরির মতো দেখতে সুন্দর নই ; হয়তো আমরা বলহরির মতো বড়লোক নই, তার মতো আমার এয়ার কন্ডিশন বাড়ি নেই, সাজানো ফ্ল্যাট নেই কিন্তু বনলতা আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি। আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। এক মুহূর্তও থাকতে পারব না।

কোনওরকমে আলিঙ্গন ছাড়িয়ে বনলতা বলল, সে তো আমি বুঝতে পারছি, আমিই কী তোমাকে কম ভালবাসি নাকি। কিন্তু এই যে বারবার বলহরি-বলহরি বলছ, এই বলহরি লোকটা কোথায় থাকে বলো তো ?

তথাপি :

তথাপি একটা এমন গল্প বাদ থেকে গেল যে সেটা না বললে অন্যায় হবে। ঠিক গল্পও নয়, একটা প্রশ্ন।

খুবই সাধারণ, সাদামাটা জিজ্ঞাসা এটা। সেই সাবেকি পুরনো একটা প্রশ্ন।

গভীর আপ্লুত কণ্ঠে প্রেমিক বেচারা প্রেমিকাকে প্রশ্ন করলেন, আনোয়ারা আমিই কী তোমার জীবনে প্রথম ?

আনোয়ারা মৃদু হেসে বললেন, ছিঃ ছিঃ এ-সব কী প্রশ্ন করছ আনোয়ার ? তুমি ছাড়া আর কে ? আর অন্য কারও কথা আসে কী করে ?

আনোয়ার বলল, তবু একেক সময় কেমন যেন খটকা লাগে।

আনোয়ারা এবার বিরক্ত হয়ে বলল, এই এক সমস্যা তোমাদের এই পুরুষমানুষদের নিয়ে। সবাই জানতে চায় সেই প্রথম কিনা ?

পুনশ্চ :

অবশেষে নিজের প্রেমের কথা বলি।

অনেকদিন আগে, তা প্রায় তিরিশ বছর, আমার এক বন্ধু কয়েকদিন ধরে অফিসে আসছিলেন না। আমরা দুপুরে একসঙ্গে চা খেতাম, আড্ডা দিতাম। একদিন কার কাছে শুনলাম, তাঁর জ্বর

হয়েছে। ভাবলাম একদিন দেখে আসা উচিত। পরের দিন দুপুরবেলা টিফিনের সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কলেজ স্ট্রিটের মেসবাড়ি, তখন মেসবাড়ি ব্যাপারটা কলকাতায় ভালভাবেই রয়েছে। আমার বন্ধুটি থাকতেন দোতলায়। ভরদুপুরের মেসবাড়ি একেবারে ফাঁকা, একতলার খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আমি বন্ধুর নাম ধরে ডাকতে থাকলাম। বেশ একটু পরে তাঁর সাড়া পেলাম কিন্তু তার আগে দ্রুতপদে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে একটি লাল শাড়ি-পরা মেয়ে আমার দিকে না তাকিয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দোতলায় আমার বন্ধুর ঘরে গিয়ে পৌঁছতে তিনি আমাকে বললেন, জ্বরটা ছেড়ে গেছে। আমি তাঁকে বললাম, হ্যাঁ, দেখলাম, এইমাত্র সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। প্রেম সম্বন্ধে আমার এই গোলমেলে মনোভাব কতটা সত্যি, এ বয়সে আর বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব না। তবে আমার এই কর্কশ কণ্ঠ, গোলাকার চেহারা, তদুপরি নিয়ত প্রতিবাদ-প্রবণ মন, কোনও দিনই সফল প্রেমিক হওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। মেয়েরা আমাকে ভয় করতে পারে, ভক্তি করতে পারে, ঘৃণাও করতে পারে, কিন্তু কখনও ভালবাসবে কিনা আমার গভীর সন্দেহ আছে।

প্রেমে বিশ্বাস করি কিনা এই প্রশ্নে আমার সংক্ষিপ্ত জবাব হল, প্রেম আমার কাছে অনেকটা ভূতের মতো। ভূতে বিশ্বাস করি না কিন্তু ভয় পাই, প্রেমেও ভয় পাই। আগে হয়তো কখনও প্রেমে পড়লেও পড়তে পারতাম, কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। তার একমাত্র কারণ অবশ্য আমার বয়স নয়। এ বয়সেও ঢের ঢের লোক প্রেমে পড়ে। আমার অসুবিধে অন্যরকম। যতদূর শুনেছি এবং সেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে পড়ে আসছি, প্রেমিকা খুব ভালভাবে ভাল ভাল সামগ্রী রেঁধে খুব যত্ন করে খাওয়ায়। আমার পক্ষে ভাল জিনিস খাওয়া এখন বিষতুল্য। এমনিই যা খাই তাতে শরীর ফুলেফেঁপে রয়েছে। তা ছাড়া প্রেম করলে শুধু রেস্তোরাঁয় বা কফিহাউসে নয়, পার্কে, নদীর ধারে হাত-পা ছড়িয়ে প্রেমিকার পাশে অনেকক্ষণ বসে থাকার নিয়ম আছে। কিন্তু আমি মেঝেতে বা উঠোনে বসতে পারি না। ওরকমভাবে বসলে দশ মিনিটেই আমার পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ফুলে ঢোল হয়ে যাবে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন সাহেবের কথা মনে পড়ে। তিনি প্রচণ্ড স্থূলাকার ছিলেন। একদা এক আসরে তিনি কায়দামাফিক হাঁটু গেড়ে বসে এক সুন্দরীকে প্রেম নিবেদন করতে যান। তারপর সুন্দরী সেই পটভূমি থেকে অন্তর্হিত

হয়ে গেলেন কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও আর গিবন সাহেব উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বহুজনের সাহায্যে তিনি উঠে দাঁড়ান। মদনদেবের কাছে আমার প্রার্থনা, এই পরিণতি থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

মাতালের গল্প

প্রায় অনুরূপ নামে আমার যে অতিচপল, অতিতরল গল্পগুচ্ছ রয়েছে, সেই গ্রন্থের পাঠকেরা অবশ্যই আশঙ্কা করতে পারেন, আমি হয়তো আবার সেই একই গল্প করতে বসেছি।

তাঁদের অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। আমার স্বভাবচরিত্র তাঁরা ভালভাবেই জানেন। চুরি করতে করতে আমার এমন স্বভাব হয়ে গেছে যে, আজকাল আমি নিজের লেখা থেকে পর্যন্ত চুরি করছি।

যাই হোক, আশ্বাস দিচ্ছি, নামে এক হলেও এবারে আর নিজের লেখা বা অন্য কারও রচনা থেকে চুরি নয়, সরাসরি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে। তদুপরি মোটেই হাসির গল্প নয়, করুণ কাহিনী, ওই যাকে বলে 'সত্য ঘটনা অবলম্বনে'।

অবশ্য প্রথম আখ্যানটি করুণ কিনা বলা কঠিন। ঘটনাটি দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠা হয়ে কলকাতার লোকদের মুখে মুখে ফিরেছে গত পক্ষে।

কলকাতার ময়দানে কৈশোরে বা প্রথম যৌবনে ক্রিকেট-ফুটবল ম্যাচ লাইন দিয়ে টিকিট কেটে দেখেনি, এ-শহরে এমন লোক বিরল। এবং এই সৌভাগ্যবানেদের মধ্যে এমন একজনও নেই, যিনি জীবনে টিকিটের লাইনে বা প্রবেশপথের মুখে দাঁড়িয়ে কারণে কিংবা অকারণে কলকাতার প্রবাদপ্রসিদ্ধ মাউন্ট পুলিশদের হাতে এবং তাদের ঘোড়াদের পায়ে লাঞ্ছিত হননি।

ময়দানের শেষ প্রান্ত মানে উত্তর সীমানা থেকে সোজা রাস্তা এসে পড়েছে চৌরঙ্গিতে। চৌরঙ্গির আগে ময়দান এলাকায় সেই রাস্তার নাম রানী রাসমণি রোড। সেই রাসমণিকে জানবাজারে তাঁর নিজের বাড়িতে যেতে হলে যেতে হবে সুরেন ব্যানার্জি রোড দিয়ে। এই সুরেন ব্যানার্জি রোডে প্রথমে একটু এগিয়ে কলকাতা পুরসভার

বিপরীতে এলিট সিনেমার পাশে মাউন্ট পুলিশের অর্থাৎ ঘোড়সওয়ার পুলিশের সদর দপ্তর।

এই সদর দপ্তরের চারপাশেই মানে জানবাজার, মেট্রো গলি, নিউ মার্কেট, ধর্মতলা ইত্যাদি স্থানে প্রচুর নেশার রসদ, পানীয়ের ঠেক। সুতরাং কোনও মধ্যরাতে, কোনও ঘোড়সওয়ার সেপাই সারাদিন ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করার পর এই পরিবেশে যদি কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত হয়ে চুরচুর মেজাজে একটির পর একটি আস্তাবলবদ্ধ ঘোড়াকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে যান, তাতে আশ্চর্য না হলেও চলবে।

সে দিন মধ্য রজনীতে নগরীর রাজপথে এক অপূর্ব দৃশ্য। একের পর এক আস্তাবল-মুক্ত, লাগামহীন ঘোড়া দুলকি চালে ময়দানের দিকে চলেছে। জন্মাবধি ওই একটি রাস্তাই তারা চেনে। ময়দানেই তাদের গতিবিধি। সে দিকেই তারা যাত্রা করেছে।

গ্রীষ্মরজনীর শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় সেই দিন সে এক অনৈসর্গিক, অভূতপূর্ব দৃশ্য কলকাতার প্রাচীন রাস্তায়। এই সময়ে রসভঙ্গ ঘটেছিল এক দায়িত্ববান কর্মীর অনুপ্রবেশে। ইনি লক্ষ করেন যে, শূন্যপৃষ্ঠ মুক্ত অশ্বগুলি ময়দানগামী হয়েছে। ইনি এদের প্রত্যেকের নাম জানেন এবং শিক্ষিত অশ্ববৃন্দ নিজেরাও নিজেদের আলাদা নাম সম্বন্ধে সচেতন। সুতরাং পিছন থেকে উচ্চস্বরে তাদের নাম ধরে ডাকামাত্র তারা কান উঁচু করে সেই ডাক শুনে, একটি করুণ হ্রেষাধ্বনি করে মুখ ঘুরিয়ে আবার গুটিগুটি নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল।

এই কাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি করুণ দুর্গাপুরের মাতালদের কাহিনী। খুব সংক্ষেপে সেটি বলব। কারণ, করুণা আমার বিষয় নয়।

দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলের একটি স্থানীয় বিবাহে একটি ভাড়াটে বাসে বরযাত্রীরা বিবাহসভায় যাচ্ছিল। এর মধ্যে একদল মদের হাঁড়ি নিয়ে উঠেছিল বাসের ছাদে। মদ্যপান, সেই সঙ্গে গান, তারপরে চলন্ত বাসের ছাদে যূথবদ্ধ নাচ। বাসের চালক নাকি দুবার গাড়ি থামিয়ে এদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। মাতাল না শোনে বিপদের বাণী।'

নৃত্যগীত চমৎকার চলছিল এবং চলত, যদি না রাস্তার ওপরে একটা রেলওয়ে ব্রিজ বাধা হয়ে দাঁড়াত। আর, বাধা মানে বিশাল বাধা। চলন্ত বাসের ওপর থেকে ব্রিজে ধাক্কা খেয়ে নর্তকেরা ছিটকে

পড়লেন চারদিকে। বেশ কয়েকজন মৃত, বাকিরা জীবন্মৃত।

এই করুণ কাহিনীর পরে এবার একটু হাল্কা গল্প বলি। রসিকতা দিয়েই শেষ করি।

আলোচ্য বিষয়টি একটি কথোপকথন, পানশালায় জনান্তিকে শোনা।

একটি টেবিলে দু'জন মুখোমুখি বসে মদ্যপান করছেন, দু'জনেই অনেকক্ষণ ধরে পান করছেন, এখন প্রায় রাত এগারোটা বাজে। এই দু'জনের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত কখ অবিবাহিত, দ্বিতীয় জন শ্রীযুক্ত গঘ বিবাহিত, মাত্র বছরখানেক আগে বিয়ে করেছেন।

শ্রীযুক্ত কখ : দাদা, বাড়ি চলুন। অনেক রাত হল।

শ্রীযুক্ত গঘ : আরেকটু বসো।

শ্রীযুক্ত কখ : দাদা, এই যে আপনি এত দেরি করে বাড়ি ফেরেন, বৌদি আপনাকে মিস করেন না।

শ্রীযুক্ত গঘ : কদাচিৎ।

শ্রীযুক্ত কখ : কদাচিৎ ?

শ্রীযুক্ত গঘ : হ্যাঁ, ভাই। তোমাদের বৌদিদির হাতের টিপ অসামান্য। স্কুলে ভাল বাস্কেটবল খেলতেন। লক্ষ্য অব্যর্থ। হাতা, খুন্তি, ফুলদানি, জুতো, বই—যা কিছু ছুড়ে মারেন, একেবারে অব্যর্থ। কখনও কদাচিৎ আমাকে মিস করেন।

বাজার

মধ্যে খবরের কাগজ থেকে ব্যাপারটা প্রায় উঠেই গিয়েছিল। দৈনন্দিন বাজারদর কোনও আলাদা কলম বা প্রতিবেদনে কাগজে প্রকাশিত হচ্ছিল না।

ব্যাপারটা আবার ফিরে এসেছে। এখন প্রায় প্রতিটি দৈনিক কাগজেই সপ্তাহান্তিক একটি প্রতিবেদন থাকে, সপ্তাহের কোনও একদিনের আনাজ-তরকারি, মাছ-মাংস, তেল-মশলার দাম নিয়ে।

বলা বাহুল্য, বহু কাগজেই এই কলমটি বেশ জনপ্রিয়। আমার নিজেরও খুব ভাল লাগে বাজার-সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাঠ করতে। অনেক প্রতিবেদকই সুললিত কাব্যময় ভাষায় বাজারের এবং

বাজারদরের মতো শুষ্ক বিষয়ের বর্ণনা করেন। অনেকের বাজার পরিক্রমায় রীতিমতো কাহিনী পাওয়া যায়। ক্রেতা, বিক্রেতা, পরিবেশ ইত্যাদির ছবি পাওয়া যায়।

অবশ্য চাল-তেলের দাম বাড়লে কিংবা আলুর দাম হুহু করে ঊর্ধ্বমুখী হলে প্রতিবেদনের মধ্যে আর্থ-সামাজিক কিছু কিছু প্রশ্নও ওঠে।

অনেক সময় কিছু কিছু স্থানীয় প্রশ্নও চলে আসে। গত ইলিশের মরশুমে এক প্রতিবেদক ডায়মন্ডহারবারে গিয়েছিলেন মাছের সন্ধানে। নিউ ক্যাসল কিংবা রানীগঞ্জ-আসানসোলে যেমন কয়লা, কিংবা মালদা-মুর্শিদাবাদে আম, ডায়মন্ডহারবারে তেমনি ইলিশ অঢেল।

সেদিন ইলিশ অঢেল না হলেও যথেষ্টই ছিল। কিন্তু প্রতিবেদকের অভিজ্ঞতা হয়েছিল অন্যরকম। ডায়মন্ডহারবারে ইলিশমাছের খুচরো দাম কলকাতার চেয়ে কম তো নয়ই বরং বেশ বেশি।

আমার নিজেরও একবার অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল বারুইপুরে। ওই দিক থেকে গাড়ি করে আসছিলাম। সে সময়টা বৈশাখের শেষ কিংবা জ্যৈষ্ঠের শুরু, লিচুর মরশুম। রাস্তার পাশে সুবিন্যস্ত লিচুবাগান থেকে থরে থরে লিচু পেড়ে ঝুড়িতে তোলা হচ্ছে।

লাল টুকটুকে লিচুর একটা আকর্ষণ আছে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে লিচুবাগানে ঢুকেছিলাম দু-এক কেজি লিচু কেনার জন্যে। কিন্তু কেনা সম্ভব হল না। ব্যাপারিরা আমাকে পাত্তাই দিল না। প্রথমে আমাকে পাত্তাই দিল না, আমার কোনও প্রশ্নের জবাব দিল না। স্পষ্টতই আমায় লিচু বেচার ইচ্ছা নেই তাদের। অনেক কষ্টে একজনের কাছ থেকে জবাব পাওয়া গেল। কিন্তু তিনি যে দাম হাঁকলেন, সে কলকাতার দেড়া অর্থাৎ দেড়গুণ। অর্থাৎ আমার বারুইপুরে বারুইপুরের লিচু কেনা হল না।

সে যা হোক, ঠিক জায়গা থেকে ঠিক জিনিস কেনা কঠিন কাজ। বর্ধমান থেকে যাঁরা মিহিদানা কিনেছেন এবং কৃষ্ণনগর থেকে সরপুরিয়া এবং কিনে ঠকেছেন, সেই ভুক্তভোগীমাত্রেই সমস্যাটা জানেন। আসলে কোনটা খাঁটি দোকান, কোনটা জাল দোকান, সেটা বোঝাই কঠিন। জি টি রোডের ওপরে শক্তিগড়ে গোটা পঞ্চাশেক ল্যাংচার দোকান, তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি নির্ভরযোগ্য। এই তো গত বছর গ্রীষ্মে সদর দার্জিলিং থেকে দেড়শো টাকা কেজি দরে উৎকৃষ্ট দার্জিলিং চা কিনে এনেছিলাম। কলকাতায় এসে সেই চা

খেয়ে থুথু করে ঢেলে দিয়েছিলাম। এত বিস্বাদ যে মুখে তুলতে পারিনি।

তবু তো দার্জিলিং-এ দার্জিলিং চা পাওয়া যায়, জয়নগরে পাওয়া যায় জয়নগরের মোয়া, জনাইতে জনাইয়ের মনোহরা। কিন্তু সম্প্রতি এক সুখ্যাত লেখক-প্রতিবেদক একটি পত্রিকায় একটি দুঃখের কাহিনী জানিয়েছেন। ভদ্রলোক গ্রাম পরিক্রমায় কাটোয়ায় গিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি 'কাটোয়ার ডাঁটা', এই লেখক-প্রতিবেদকও শুনেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সমস্ত কাটোয়ায় তন্নতন্ন করে ঘুরেও ভদ্রলোক একটিও কাটোয়ার ডাঁটা দেখতে পাননি।

এবার আমার নিজের তরমুজ কেনার কথা বলি। এমন যে দেবভোগ্য ফল তরমুজ, একালে তার বড় নিন্দেমন্দ, কারণ তার বাইরেটা সবুজ, ভেতরটা লাল ; তার ভেতর-বাইরে একরকম নয়। রাজনীতির প্রসঙ্গে যাওয়া উচিত হবে না। আমার নিজের তরমুজের কাহিনীটা নেহাতই নাজেহাল হওয়ার কাহিনী।

কাকদ্বীপে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম বাজারের পাশে তরমুজের আড়ত, পাহাড় প্রমাণ তরমুজ। বড় বড় দাঁড়িপাল্লায় বস্তা বস্তা ওজন হচ্ছে, ট্রাকে উঠছে।

ডায়মন্ডহারবারের ইলিশ কিংবা বারুইপুরের লিচুর মতো নয়, স্থানীয় দাম বেশ সস্তা। কলকাতায় যেখানে কেজি প্রতি দর তিন টাকা—সাড়ে তিন টাকা, এখানে পাইকারি দাম দেড় টাকা, পৌনে দু টাকা। সস্তা দেখে, লোভে পড়ে গোটা পাঁচেক তরমুজ বেছে বেছে কিনে ফেললাম। প্রায় পনেরো কেজি ওজন হল। বড় একটা নিজের জন্যে। বাকিগুলো উপহার দেওয়ার জন্যে, অতি খুঁতখুঁতে বন্ধুও এই গরমে একটা শীতল লাল তরমুজ পেলে খুশি হবে। বাসে ফিরব। সরকারি বাস। সরাসরি কাকদ্বীপ থেকে ধর্মতলা। পাঁচটা বড় তরমুজ একসঙ্গে কোলে করে নিয়ে আসা অসম্ভব। তাও চেষ্টা করেছিলাম, আশেপাশের দুয়েকজন কিছুটা সাহায্যও করেছিল তরমুজগুলো আমার কোলে বসিয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু সম্ভব হল না। তরমুজের গোলাকারই এর প্রধান কারণ, বারবার কোল থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগল। ওজনও কম নয়। বাধ্য হয়ে দরদাম করে সস্তার একটা চটের ব্যাগ কিনলাম আট টাকা দিয়ে। বাসে উঠবার পরে কন্ডাক্টর মাল ভাড়া চাইলেন। মৃদু আপত্তি করে তার পর সেটাও দিলাম। বিপত্তি হল ধর্মতলায় নেমে। অকাল কালবোশেখি,

ঝোড়ো হাওয়া, প্রবল বৃষ্টি। ট্রামে বাসে ওঠার উপায় নেই, ভয়ানক ভিড়। বাস স্টপে এসে দাঁড়ালাম। আধঘণ্টাখানেক দাঁড়ানোর পর ঠেলাঠেলি করে একটা গাদাগাদি ভিড় বাসে উঠতে গিয়ে সস্তার চটের ব্যাগটা ছিঁড়ে গিয়ে এক-এক করে পরপর পাঁচটি তরমুজ ভেজা রাস্তায় বৃষ্টিতে গড়াতে লাগল। আমি বাস থেকে নেমে সেগুলো উদ্ধার করতে পারলাম না। তখন আমি কলে পড়া ইঁদুরের মতো ভিড় বন্দি, অগ্রপশ্চাৎ করার অবকাশ নেই। কালো রাস্তায় সবুজ তরমুজগুলো গড়াতে গড়াতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মনের কথা

'সই লো সই
দুটো মনের কথা কই।'

মন, তুমি কৃষিকাজ জানো না।

শুধু কৃষিকাজই নয় মন অনেক কিছু জানে না। আবার এমন অনেক কিছু জানে যা ভাবা যায় না।

তাই তার এত ব্যাকুলতা, এত অস্থিরতা। তাই সে মেঘের সঙ্গী হতে চায় না। তাই তার কোথাও হারিয়ে যাওয়ার মানা নেই। সে জন্যেই 'সই লো সই, দুটো মনের কথা কই', দুটো মনের কথা শোনার জন্যে মন নিজেই মনের মানুষ খোঁজে।

কিন্তু মনের মন্থরতম, গোপনতম কথা বলার লোক মেলা কঠিন। সব কথা কাকেই বা বলা যায়। তবু মন হুহু করে ওঠে সব কথা বলার জন্যে, স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, মা-বাপ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ নয়, এমন কাউকে সব কথা বলা যিনি নির্বিকারভাবে এ-সব কথা শুনে যাবেন, যাঁর কাছে মনের ভার উজাড় করা যাবে।

এই মনের ভার উজাড় করার জন্যে সাহেবদের দেশে মনস্তত্ত্ববিদেরা রয়েছেন। আমাদের দেশে মনের চিকিৎসার এখনও তেমন প্রচলন ঘটেনি।

মানুষ মনে মনে নিজেকে কত কি ভাবে। নিজেকে কেউ ভাবে রাজা উজির, কেউ ভাবে উত্তমকুমার। কিন্তু সবাই যে ভালর দিকে

ভাবেন তা নয়, এক সাহেব নিজেকে ভাবতেন কুকুর। এক মনোবিজ্ঞানী বহুদিন ধরে তাঁকে দেখলেন, তাঁর চিকিৎসা করলেন, তাঁকে বোঝালেন যে, 'তুমি কুকুর হতে যাবে কেন, তুমি একটি আস্ত মানুষ।' সাহেবের ধীরে ধীরে চৈতন্যোদয় হল, তখন একদিন সেই মনোবিজ্ঞানী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি যে কুকুর নন, সেটা তা হলে এত দিনে বুঝতে পেরেছেন।' সাহেব বললেন যে, 'হ্যাঁ স্যার, এখন আর আমার মনে ওসব ধারণা নেই।'

'মনোবিজ্ঞানী' তখন বললেন, 'তা হলে তো আপনি এখন বেশ ভাল আছেন।' এই কথা শুনে সাহেব বললেন, 'নিশ্চয় স্যার। আপনি আমার এই নাকের নীচে হাত দিন, দেখুন কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা।' ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, কুকুরদের শরীর ভাল থাকলে নাকের নীচটা ঠাণ্ডা থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে সাহেবের কথা শুনে মনোবিজ্ঞানী নিশ্চয় খুবই হতাশ হয়েছিলেন, কারণ তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন সাহেবের কুকুরত্ব এখনও যায়নি।

সত্যিই এ-সব ব্যাপার সহজে যাওয়ার নয়। এক মেমসাহেবের ধারণা ছিল যে তিনি গরু। বহু চেষ্টা করেও মনোডাক্তার যখন তাঁকে মনুষ্যত্বে ফেরাতে পারলেন না, তিনি জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা মেমসাহেব আপনি কবে থেকে বুঝতে পারলেন যে আপনি গরু।' মেমসাহেব নির্বিকারভাবে জবাব দিলেন, 'সেই যবে বাছুর ছিলাম সেই তখন থেকে।'

এ-সব মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়ে, পুনর্মনুষ্য হয়ে সবাই যে খুশি হয় তা নয়। এক ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পরে আক্ষেপ করেছিলেন, 'গতকাল পর্যন্ত আমি একটা বিশাল গণ্ডার ছিলাম, আর আজ আমি সামান্য একটা মানুষ।'

প্রাতঃস্মরণীয় শিবরাম চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'দুইয়ে দুইয়ে শুধু চার হয় তা নয়, অনেক সময় দুইও হয়।' যাঁদের মানসিক সমস্যা আছে তাঁদের ব্যাপার আরও সূক্ষ্ম। তাঁদের কেউ কেউ ভাবেন দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ কিংবা তিন হয়। আবার কেউ কেউ ঠিকই জানেন দুইয়ে দুইয়ে চারই হবে কিন্তু তাঁদের চারটা তেমন পছন্দ নয়, তাঁদের বক্তব্য চার না হয়ে অন্য কিছু হলে ভাল হত।

এগুলি জটিল মনস্তত্ত্বের ব্যাপার, এবার সরল ব্যাপারে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। এক মানসিক হাসপাতালে পাশাপাশি দুটি ঘর, নয় নম্বর ঘর এবং দশ নম্বর ঘর। নয় নম্বর ঘরে রয়েছেন ভূতনাথ আর দশ নম্বর ঘরে রয়েছেন দেবনাথ। ভূতনাথবাবু এবং দেবনাথবাবু

দুজনারই মনের চিকিৎসা চলছে। দুজনেরই ব্যাপারটা খুবই জটিল, যদিও বাইরে থেকে দেখে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ কিছুই বোঝা যায় না। তাঁদের মানসিক বৈকল্যের একমাত্র লক্ষণ যে তাঁরা সর্বক্ষণ 'জপমালা', 'জপমালা' করছেন, জপের মালার মত সারাদিন এই নাম জপছেন দুজনে। একদিন পরিদর্শক এসেছেন হাসপাতালে। তিনি এই দুই ভদ্রলোকের বিচিত্র ব্যাপার দেখে ডাক্তারবাবুর কাছে জানতে চাইলেন, এঁদের মাথা খারাপ হল কী করে আর ওই জপমালাই বা কে? ডাক্তারবাবু যা বললেন তা অতিশয় চমকপ্রদ, 'ওই যে ভূতনাথবাবু জপমালা নামে এক মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন, তার পর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে জপমালাদেবীকে বিয়ে করতে না পেরে এই রকম হয়ে গেছেন।' এই পর্যন্ত শুনে পরিদর্শক মহাশয় সরলভাবে বললেন, 'এই দেবনাথবাবু উনিও প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, ওই একই জপমালা পালকে জীবনে না পেয়ে সারাদিন 'জপমালা', 'জপমালা' জপে যাচ্ছেন।' ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'না। আসল ব্যাপার ঠিক এর উল্টো। দেবনাথবাবু প্রেমে সফল হয়ে জপমালাদেবীকে বিয়ে করেছিলেন। ঘটনাবলী দুজনার ক্ষেত্রে দুরকম ফল দিয়েছে। ভূতনাথবাবু জপমালাদেবীকে না পেয়ে পাগল হয়ে গেছেন আর দেবনাথবাবু জপমালাদেবীকে পেয়ে পাগল হয়ে গেছেন।'

সুতরাং কী কারণে কার মনে কী হয় কেউ বলতে পারে না। এ বিষয়ে এর আগে আমি অনেক লিখেছি, আমারও আর কিছু বলার নেই। শুধু শুধু চর্বিত চর্বণে, গরুর মতো জাবর কেটে কী লাভ! সব শেষে সেই ভদ্রলোককে মনে পড়ছে, খেয়াল করতে পারছি না তাঁর কথা এই শেষ মেলেও লিখে ফেলেছি কি না। পাঠক-পাঠিকা আমার অনুরূপ একশো আটটি দোষ ক্ষমা করেছেন নিশ্চয় এর পরেও ক্ষমা করবেন।

খুব ছোট করে বলছি। আমার এক অনতি পরিচিত খ্যাপা প্রতিবেশী জীবনগোপালবাবু সেদিন আমাকে বলেছিলেন, 'মিস্টার রায়, আমার নাম যদি জীবনগোপাল না হত, তা হলে কী বিপদ হত?' আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'কী বিপদ?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'আপনারা সবাই আমাকে জীবনগোপাল বলেন, আমার নাম যদি জীবনগোপাল না হত তা হলে কী হত?'

এই জীবনবাবুর মানসিক সমস্যাগুলি অতি বিচিত্র। তিনি খুব আইসক্রিম ভালবাসেন, তাঁর মন চায় আইসক্রিম খেতে।

কিন্তু এদিকে আবার তাঁর অসুখের ভীষণ বাতিক। সব সময়েই

ভয় পাচ্ছেন এই বুঝি কোনও মারাত্মক ব্যাধি সংক্রামিত হল। আবার আইসক্রিমের লোভও ত্যাগ করতে পারেন না। অবশেষে তিনি নিজেই এর একটা মধ্যবর্তী সমাধান বার করেছেন। বাজার থেকে আইসক্রিম কিনে এনে আজকাল ফুটিয়ে খাচ্ছেন।

কিন্তু এ তো তবু ভাল। গত রবিবার সকালবেলা বাসায় যখন চা খেতে বসেছি হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে জীবনবাবুর চিৎকারে চায়ের পেয়ালা ফেলে ছুটে গেলাম।

কী ব্যাপার ? আজ কিছুদিন হল জীবনবাবুর মাড়ি ফোলা, দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে, তিনি কাল সন্ধ্যাবেলা দাঁতের ডাক্তার দেখিয়েছেন, ডাক্তারবাবু তাঁকে কয়েকদিন টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে বারণ করেছেন, বলেছেন আঙুল দিয়ে দাঁত মাজতে।

কিন্তু হাতের আঙুলে তো কত রকম জীবাণু, অদৃশ্য ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস থাকতে পারে বিশেষ করে নখের কোণে। সুতরাং মোক্ষম পথ বেছে নিয়েছেন জীবনবাবু, দাঁত মাজায় নিজের ডান হাতের তর্জনীটা জীবাণু মুক্ত করার জন্যে টগবগে গরম জলে চুবিয়েছেন এবং তারই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এই আর্তচিৎকার।

আমি গিয়ে দেখলাম জীবনবাবুর আঙুলে মুহূর্তের মধ্যে বিশাল ফোসকা পড়ে গেছে আর তিনি তর্জনী মাথার ওপরে তুলে লাফাচ্ছেন। জীবনবাবু লাফাতে থাকুন। ততক্ষণে এই নিবন্ধ শেষে আপনাদের একটা উপদেশ দিচ্ছি।

পাগলকে হেলাফেলা করবেন না, বিপদ হতে পারে।

কফি হাউসের দরজায় এক বলবান পাগল কাউকে ঢুকতে কিংবা বেরোতে দেখলে দুটো টাকা চাইত একজনের কফি খাওয়ার জন্যে। এক সদয় ভদ্রলোক তাকে দশ টাকার একটা নোট দিয়ে বলেছিলেন, 'এক কাপ কেন, আপনি পাঁচ কাপ কফি খান এই টাকা দিয়ে।' পরের দিন সেই সদয় ভদ্রলোক যখন আবার কফি হাউসে ঢুকছেন সেই বলবান পাগল এক ঘুষি মেরে তাঁকে চিত করে ফেলে দিল। হতবাক এবং মর্মাহত ভদ্রলোক কিছুই না বুঝতে পেরে সিঁড়ির ওপর থেকে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার ? কাল দশটা টাকা দিয়েছিলাম, এই বুঝি তার প্রতিদান ?'

পাগল তখন গজরাচ্ছে, গজরাতে গজরাতে সে বলল, 'শালা, তোর জন্যে পাঁচ কাপ কফি খেয়ে কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি।'

পুনশ্চ :

এ গল্পটা তো সবাই জানেন তবু আবার বলি। মানসিক

চিকিৎসালয়ে এক ভদ্রলোক গিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, 'আপনাদের এখান থেকে কি আজকালের মধ্যে কোনও পাগল পালিয়েছে ?'

চিকিৎসালয়ের লোকেরা অবাক হয়ে বলেছিল, 'কই না তো।' কিন্তু আপনি হঠাৎ আমাদের এখানে এসে এ প্রশ্ন করছেন কেন ?' এই প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'বাসায় গিয়ে শুনলাম আমার স্ত্রী যেন কার সঙ্গে পালিয়েছে। কিন্তু পাগল ছাড়া আর কে আমার বউকে নিয়ে পালাবে, তাই খোঁজ করতে এলাম।'

চিনা-অচিনা

সেই কবে চীনাংশুক থেকে শুরু হয়েছিল, তারপর চিনি, চিনেজবা, চিনে মাটি এমনকি সধবার সিঁথেয় চিনে সিঁদুর। আমি চিনি গো চিনি তারে। চিনেদের সঙ্গে আমাদের বহুকালের চেনা। তাদের আর আমাদের গল্পগুজব হিমালয়ের গিরিপথ ধরে বহুকাল ধরে যাতায়াত করছে দু'দিকে।

সম্প্রতি ইন্দ্র মিত্র 'রহস্যালাপ' গ্রন্থে 'চীনে রঙ্গ' পরিচ্ছেদে অসামান্য কয়েকটি রসকথিকা বাঙালি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি মাতালের গল্পও রয়েছে। 'সিদ্ধি' দিয়ে যেমন সব শুভকাজের কেনাকাটার সূচনা করতে হয়, তেমনিই মাতাল-কাহিনী শিরোধার্য করে চিনে রঙ্গে প্রবেশ করি।

এক বাড়িতে খুব খানাপিনা হচ্ছে। বিশাল পার্টি। বন্ধু-বান্ধব, কাছের-দূরের অতিথি অভ্যাগতে জমজমাট সন্ধ্যা ক্রমশ গভীর রাতের দিকে গড়াচ্ছে। এই সময়ে একজন অতিথি ঘোষণা করলেন, 'যাদের দূরে চলে যেতে হবে, তাদের এখনই চলে যাওয়া উচিত।'

এ কথায় কাজ হল। ধীরে ধীরে সবাই যে যার বাড়ির পথ ধরল। শুধু যিনি এ কথাটা বললেন, তিনি গেলেন না, বাড়ির কর্তার সঙ্গে বসে মদ খেয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে মদ যখন প্রায় শেষ, তিনি আবার ঘোষণা করলেন, 'যাদের যেতে হবে তাদের এখনই চলে যাওয়া ভাল।'

বাড়ির কর্তা এ কথা শুনে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী কথা ? এখানে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু তুমি বাকি আছ

যাওয়ার, আর কে যাবে ?'

এবার ঘোষণাকারী বললেন, 'সেই কথাই যে বলছি। আমি তো এখানেই শুয়ে পড়ব, আমাকে তো যেতে হবে না। তোমাকেই এখান থেকে হেঁটে নিজের শোয়ার ঘরে যেতে হবে।'

মাতালের গল্পের মতই চিনে ডাক্তারের গল্পও চমৎকার। এককালে কলকাতায় চিনে ডাক্তার বলতে দাঁতের ডাক্তার বোঝাত। এই সেদিনও কলকাতার রাস্তাঘাটে পাড়ায় পাড়ায় 'Chinese Dentist' লেখা সাইনবোর্ড চোখে পড়ত, এখন আর তেমন দেখি না।

সে যা হোক, এ হল আসল চিনে ডাক্তারের গল্প। চিন দেশের চিকিৎসকের গল্প। এই গল্পে চিকিৎসক মহোদয় নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খুব খারাপ অসুখ, বাঁচার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

চিকিৎসকমহোদয়ের এক বন্ধু এসেছেন তাঁকে দেখতে। তিনি সেই বন্ধুকে বললেন, 'দেখো আমার কাছে একটি চমৎকার ওষুধ আছে। যে কোনও অসুখই হোক, যত মারাত্মকই হোক, সেই ওষুধ এক ডোজ খেলে সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্তি। তারপর আর কোনও অসুখ হবে না, হেসে খেলে ফুর্তি করে একশো বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকা যাবে।'

এই কথা শুনে স্বাভাবিক কারণেই বন্ধুটি বললেন, 'তা হলে তুমি নিজেই খাচ্ছ না কেন অমন আশ্চর্য একটা ওষুধ ?' এই কথা শুনে ডাক্তারবাবু হেসে ফেললেন, বহুদিন পরে হাসলেন, তারপর বললেন, 'কী বলছ তুমি ? কোনও দিন শুনেছ, কোনও বড় ডাক্তার নিজের অসুখে নিজে ওষুধ দিয়েছে ? নিজের অসুখ নিজে চিকিৎসা করেছে ?'

মাতালের গল্প হল, ডাক্তারের গল্প হল, এর পর চিনে শিল্পীর গল্প।

শিল্পী মানে চিত্রকর, আর্টিস্ট। চিত্রকর মহোদয় নতুন গ্যালারি করেছেন। গ্যালারির দরজার দু'পাশে নিজের এবং নিজের স্ত্রীর ছবি এঁকে টাঙিয়ে দিয়েছেন। হঠাৎ একদিন চিত্রকরের শ্বশুরমশায় এসেছেন। ঘরের সামনে নিজের মেয়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখে জামাতাকে কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কী ? কে এই মেয়েটি ? কার ছবি এঁকেছ তুমি ?'

জামাতা বেচারি করজোড়ে বললেন, 'সে কী চিনতে পারছেন না ? এ তো আমার স্ত্রীর, আপনার মেয়ের ছবি।'

এবার পাশের ছবিটির দিকে তাকিয়ে শ্বশুরমশায় বললেন, 'তাই নাকি ! তা হলে তুমি আমার মেয়ের ছবির পাশে একটা অচেনা পুরুষমানুষের ছবি টাঙিয়ে দিয়েছ কেন ?'

চিনে রঙ্গের শেষ নেই। এবারের গল্পে শ্বশুরমশায় নেই, শাশুড়ি ঠাকরুন আছেন। পুরনো যুগের গল্প। তখনও আয়না সহজলভ্য নয়। ঘরে ঘরে আয়না ছিল না।

এদিকে, গ্রামের বাজারে নতুন আয়না এসেছে। শাশুড়ি ঠাকরুন এসেছেন দেখে জামাতা বাবাজীবন বহু ব্যয়ে একটি আয়না কিনে এনেছেন। সেটি তিনি বাজার থেকে ফিরে স্ত্রীর হাতে দিয়েছেন। সেই আয়নায় বউ নিজের মুখ দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল, তারপর আয়নাটা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'মা আমার সর্বনাশ হয়েছে। আমার বর বাড়িতে আরেকজন বউ নিয়ে এসেছে।'

মেয়ের হাত থেকে আয়নাটা নিয়ে শাশুড়ি আয়নাটায় নিজের মুখ দেখতে পেলেন, তিনিও মেয়ের মতোই কেঁদে উঠলেন, 'ওরে আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। ওরে তোর বর কী শুধু আরেকজন বউ নিয়ে এসেছে, এ যে দেখছি আরেকটা শাশুড়িও নিয়ে এসেছে।'

পুনশ্চ : চিনে রঙ্গের অনেকগুলিই পুরনো চেনা গল্প। চেনা অথবা চিনে গল্প। সেই চিনা গল্প দিয়েই শেষ করি।

এ গল্পটির উৎস কোথায় তা জানি না, কিন্তু ছোট বয়েসে এ গল্প আমরাও শুনেছি। তবে, ইন্দ্রমিত্র তাঁর 'চীনে রঙ্গ' পরিচ্ছেদে যে অসামান্যভাবে পরিবেশন করেছেন এই রসকাহিনী, সে ভাবে আগে শুনিনি। এটাও ডাক্তারের গল্প। এই গল্পের ডাক্তারবাবুর ছেলেও ডাক্তারি পড়ে।

ডাক্তারবাবু ভিন গাঁয়ে রোগী দেখতে গিয়েছেন নদী পার হয়ে। দুর্ভাগ্যবশত সেদিন সেই গাঁয়ে পর পর তিনজন রোগী মারা গেল ডাক্তারবাবুর হাতে। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা লাঠিসোটা নিয়ে ডাক্তারবাবুকে তাড়া করে এল। গত্যন্তর না দেখে ডাক্তারবাবু ছুটে গিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তিনি সাঁতার জানতেন, গ্রামবাসীরা জানত না। প্রাণপণে নদী সাঁতরে নিজের বাড়িতে ঢুকে দেখলেন, ছেলে মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। 'কী বই পড়ছ', জিজ্ঞাসা করায় ছেলে বলল, 'ডাক্তারি বই পড়ছি।' ভেজা জামাকাপড় পরে হাঁফাতে হাঁফাতে ডাক্তারবাবু বললেন, 'ডাক্তারি বই পড়া দরকার, কিন্তু সাঁতার জানা আরও বেশি দরকার।'

কয়েকটি অবিশ্বাস্য রসিকতা

মনীষী অক্ষয় সরকারের সুরসিক পিতৃদেব চুঁচুড়ার গঙ্গাচরণ সরকারের কথা আগে একবার লিখেছি। কিন্তু আমারই দোষে একটা চমৎকার, প্রায় অবিশ্বাস্য উপাখ্যান বাদ রয়ে গেছে।

অক্ষয়চন্দ্র একবার বাবা গঙ্গাচরণের সঙ্গে থিয়েটারে গেছেন, 'মেঘনাদ বধ' নাটক। মেঘনাদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁর স্ত্রী প্রমীলা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাচ্ছেন। পাশে চিতা সাজানো হয়েছে। সেই চিতার পাশে রাবণ এসে বিরাট এক ডায়ালগ দিয়ে মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন।

এখন মঞ্চে চিতার সামনে প্রমীলা একা। এদিকে, চিতা নিভতে বসেছে, তাই দেখে প্রমীলা নিজেই নিজের চিতা ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন, ওদিকে, তাঁকে ডায়ালগও দিতে হবে।

এই দৃশ্য দেখে স্বাভাবিক কারণেই অক্ষয় সরকার বললেন, 'এদের কি কেউ নেই? এত বড় লঙ্কারাজ্য, ভৃত্য-পরিচারক, কাজের লোকেরা সব গেল কোথায়?'

ছেলের কথা শুনে গঙ্গাচরণ নাকি বলেছিলেন, 'রাম কি আর কাউকে রেখেছে রে? রাক্ষসপুরী একেবারে শূন্য করে দিয়েছে।'

এর পরের গল্পটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং এক পকেটমারকে নিয়ে। গল্পটি সম্ভবত সত্যি নয়, কিন্তু বেশ ভাল।

তখনও কলকাতার আর হাওড়ার মধ্যে গঙ্গার ওপরে নতুন বা পুরনো কোনও লোহার সাঁকোই তৈরি হয়নি, ভাসমান কাঠের পুল দিয়ে পারাপার করতে হয়। একদিন শরৎচন্দ্র পায়ে হেঁটে সাঁকো পার হয়ে হাওড়া ফিরছিলেন। তাঁর জামার বুকপকেটে চেন দেওয়া পকেটঘড়ি। অনেকের হয়তো এখনও মনে আছে যে, তখনকার জামায়-পাঞ্জাবিতে বুকপকেটের মধ্যে তিন কোণাচে ঘড়ির পকেট থাকত। যাদের ঘড়ি নেই তারা সেই পকেটে টাকার নোট, দরকারি কাগজ—এই সব রাখত। আমরা ছোট বয়েসে দর্জির দোকানে বায়না করতুম, 'ওপরের পকেটের মধ্যে ঘড়ির পকেট দিতে হবে। সেটা ছিল সাবালকত্বের সোপান বেয়ে ওঠার প্রথম ধাপ।

সে যা হোক, ভরদুপুর। হাওড়ার পুলে খুব ভিড়, লোক ঠেলাঠেলি। শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি হাঁটছেন, এমন সময় তাঁর খেয়াল হল কেউ একজন তাঁর ঘড়ির পকেট থেকে চেনটা ধরে টান দিয়েছে,

ঘড়িটা তুলে নেবার জন্যে।

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শরৎচন্দ্র পকেটমারের হাত ধরে ফেললেন, 'কী ব্যাপার ? এটা কী হচ্ছে ?' শরৎচন্দ্রের ধমকের জবাবে পকেটমার বলে উঠল, 'স্যার কটা বাজে আপনার ঘড়িতে, তাই দেখতে যাচ্ছিলাম।' সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র পকেটমারের পিঠে একটা দুম করে ঘুসি মেরে বললেন, 'একটা।'

ঘুসি খেয়ে একটু দম নিয়ে পকেটমার বলল, 'খুব বেঁচে গেলাম স্যার।' শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মানে ?' 'মানে আর কী স্যার ?' পকেটমার বলল, 'বারোটা বাজলে শেষ হয়ে যেতাম যে।'

অতঃপর দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র, যাঁকে বলা হত শরৎ পণ্ডিত। শরৎ পণ্ডিতের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মধুর রসিকতার সম্পর্ক ছিল। তখন শরৎ পণ্ডিত 'বিদূষক' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন। এদিকে, শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে চারদিকে শোরগোল তুলেছে।

এই সময়ে একদিন এক সাহিত্যবাসরে দুই শরৎচন্দ্রে দেখা। দাদাঠাকুরকে আসতে দেখে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র নাকি হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, 'এসো, এসো হে, বিদূষক শরৎচন্দ্র।'

দাদাঠাকুরও সহজে ছেড়ে কথা বলার লোক নন। তিনিও নাকি উত্তরে বলেছিলেন, কেমন আছো, চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র।'

এই গল্পটি বহুশ্রুত, বহুস্কৃত। কিন্তু কেমন অবিশ্বাস্য, বোধহয় সত্যি নয়। সত্যি না হলেও, বিশেষ কিছু আসে যায় না। এবং শরৎ পণ্ডিত মানে দাদাঠাকুরের নিজের সম্পর্কে একটি বিশ্বাসযোগ্য কথা স্মরণ করি।

দাদাঠাকুরকে কে একজন নাকি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনার উপাধি পণ্ডিত হল কী করে ?' তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'আমি পণ্ডিত নই তো তবে পণ্ডিত কে ? আমি পণ্ড থেকে পণ্ডিত। যখন কোনও কিছু খণ্ড খণ্ড করা হয় তখন সেটা হয় খণ্ডিত, ঠিক সেইরকম আমি যখন যেখানে যাই সেখানে সব পণ্ড হয়ে যায়। আর, সেই সুবাদেই আমি হলাম পণ্ডিত, শরৎ পণ্ডিত।'

অবশেষে নবদ্বীপধামের একটি বিখ্যাত প্রাচীন রসিকতার কাহিনী স্মরণ করি। এটিও প্রায় অবিশ্বাস্য।

বহুযুগ ধরে নবদ্বীপধাম ছিল বাংলার সংস্কৃতির রাজধানী। পাণ্ডিত্য ও রসবোধ নবদ্বীপের ঘরে ঘরে।

নবদ্বীপের এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত মধ্যাহ্নভোজনে বসেছেন। ব্রাহ্মণীর নাম পঞ্চাননীদেবী। সেদিন খেতে বসে ভাতের থালার পাশে জল না দেখে পণ্ডিত বুঝলেন গৃহিণী জল দিতে ভুলে গেছেন। পণ্ডিত গৃহিণীকে সম্বোধন করে বললেন, 'পাঁচী, পঞ্চী, প্রণঞ্চি, পঞ্চাননী, বারি আনয়।'

ব্রাহ্মণী সুরসিকা, তিনি উত্তর দিলেন, 'আর্য, আচার্য, ভট্টাচার্য, শিরোধার্য, গঙ্গোদকম বা কূপোদকম (গঙ্গার জল না কুয়োর জল) ?

শিশুপাল বধ

মহাভারতে শিশুপাল বধের কাহিনী আছে। শিশুপাল ছিলেন চেদি রাজ্যের নরপতি। পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞকালে শ্রীকৃষ্ণ চেদিরাজা শিশুপালের প্রাণসংহার করেন।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে এই শিশুপাল সম্পর্কেই প্রবাদ-প্রবচনের শত দোষের আখ্যানটি জড়িত। শিশুপাল ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। পিসি শ্রুতশ্রবা জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা তার পুত্র শিশুপাল হত হবে। শ্রুতশ্রবা শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন শিশুপালের একশোটি দোষ ক্ষমা করে দেন।

শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের প্রত্যেকটি দোষ এক এক করে গুণে রেখেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় শিশুপাল অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "পিসির অনুরোধে শিশুপালের নিরানব্বইটি দোষ এ পর্যন্ত আমি ক্ষমা করেছি। কিন্তু আর নয়। আজ শিশুপালের শত দোষ পূর্ণ হল। আজ শিশুপালকে সংহার করতে হবে।"

প্রথমেই বলেছি অপ্রাসঙ্গিক, আমাদের এই রচনায় মহাভারতের শিশুপাল কাহিনী প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার। আমি যে শিশুপালের কথায় আসতে চাইছি সে পুরাণোক্ত চেদিরাজা নয়, এখানে শিশুপাল একটি সমাসবদ্ধ পদ, যার ব্যাসবাক্য হল শিশুর পাল শিশুপাল, ব্যাকরণ কণ্টকিত বালক বয়েসের কিছু স্মৃতিবেদনা এখনও যাঁদের আছে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই সমাসটা হল ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

আমার এই নিবন্ধ আধুনিক শিশুপাল বধের বিষয়ে। মাননীয় সম্পাদকমহোদয় আমাকে জানিয়েছেন, 'শিশুদের উপর যে এখন নানারকম চাপ পড়ছে তা নিয়ে এই লেখাটি হতে পারে।'

অনুমান করি, সম্পাদকমহোদয় জানেন, গুরুগম্ভীর বিষয়ে কিছু লিখতে গেলে 'থাম্বস আপ' নামক একটি জটিল বিলিতি অসুখ আমার দেখা দেয়, অসুখটায় তেমন কষ্ট নেই শুধু হাতের বুড়ো আঙুলটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সেটাকে নামাতে পারি না, কলমও হাতে ধরতে পারি না।

তবু সম্পাদকমহোদয়ের আদেশ শিরোধার্য করে মহাভারতের ভারী কাহিনী দিয়ে এই রচনা শুরু করেছি। এবার মূল রচনায় মনোনিবেশ করি।

প্রথমেই রশিপুরম কে লক্ষ্মণের একটা পুরনো কার্টুনের কথা মনে পড়ছে। কার্টুনটা কয়েক বছর আগের, বেরিয়েছিল দিল্লির এক ইংরেজি কাগজে।

কার্টুন কাহিনীটি খুবই করুণ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ঘরে প্রধান শিক্ষকের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বিহ্বল শিশু, বছর সাত-আটেক বয়েস হবে তার। তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন শিশুটির পিতামহ, তাঁর মুখচোখেও কেমন একটা বিভ্রান্ত ভাব। শিশুটির পিতামহকে হেডমাস্টারমশাই বলছেন, 'না। আপনার নাতিকে প্রমোশন দেওয়া যাবে না। অসম্ভব। সে ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত, অঙ্ক, ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, অঙ্কন, ব্যায়াম, আর কি বলব, সে আঠারোটি বিষয়ের মধ্যে দশটায় ফেল করেছে।'

জানি না, অতঃপর উক্ত কার্টুনের পিতামহ কী করেছিলেন বা কী বলেছিলেন, তবে অনুমান করতে পারি, তাঁর মনে পড়েছিল সেই সময়ের কথা যখন তাঁর বয়েস ছিল তাঁর নাতির সমান, যখন তাঁর বিদ্যার সম্বল ছিল তিনটি চটি বই, বিদ্যাসাগর মহোদয়ের বর্ণপরিচয় (অথবা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা), প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্টবুক আর শুভঙ্করী ধারাপাত। সেই সঙ্গে কালো স্লেট। পাথরের স্লেট ক্ষণভঙ্গুর বলে এবং দুর্মূল্য বলে, দুর্মূল্য মানে এখনকার বিশ-পঁচিশ পয়সা দাম হবে, পাথরের স্লেটের জায়গায় হালকা টিনের কলাইকরা স্লেট সেই সময়ে উঠেছিল।

বর্ণপরিচয়ের কথা যখন এসেই গেল তবে এই সূত্রে সেই পুরনো গল্পটাও ছুঁয়ে যাই। গল্পটা অবশ্য আমার নয়, সুরসিক সাহিত্যিক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের। যতদূর মনে পড়ে এই গল্পটিকে

রম্যরচনায় আমি আগেও একবার স্মরণ করেছি, আবারও তাঁর বিনানুমতিতে ব্যবহার করছি এই ভরসায় যে, আমার এই পল্লবগ্রাহী স্বভাব সম্পর্কে অধ্যাপকমহোদয় নিশ্চয় অবহিত আছেন এবং নিজ গুণে সেটা মার্জনা করবেন।

ইংরেজি ভাষায় বেশ কিছুকাল হল নভোরিচ (nouvean riche) বলে একটি ফরাসি শব্দ যুক্ত হয়েছে। শব্দটির মানে হল নতুন বড়লোক, আপ-স্টার্ট। যেমন কালোবাজার চোরাচালান বা ফাটকাবাজির দৌলতে হঠাৎ বড়লোক, শিক্ষাদীক্ষা এবং সংস্কৃতিবিহীন অন্তঃসারশূন্য মানুষ, কিন্তু টাকার চাকচিক্যে সেই ঘাটতি চাপা পড়ে গেছে।

সে যা হোক এক শিক্ষিত কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক এইরকম এক নভোরিচের সঙ্গে নিজের সুশিক্ষিতা মেয়ের বিবাহ স্থির করেছেন। একবারও খোঁজ করেননি ধনবান হবু জামাতা কতটা লেখাপড়া জানে। তবু, বোধহয় সংস্কারবশত, আশীর্বাদের দিন ভাবী শ্বশুরমহোদয় পাত্রের কাছে জানতে চাইলেন, 'তা, বাবাজীবনের লেখাপড়া কেমন ?'

এই কথা শুনে বাবাজীবন পা দোলাতে দোলাতে এবং সিগারেটের ধোঁয়ার রিঙ বানাতে বানাতে বললেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ওয়ার্কস দুই ভলিউম পড়া আছে।'

মাননীয় সম্পাদকমহোদয়, পাঠকবন্ধুরা, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন বিদ্যাসাগর ওয়ার্কসের দুই ভলিউম মানে বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

আমার মতো অশিক্ষিত লোকের পক্ষে বলা কঠিন হবু জামাতার এতাদৃশ বিদ্যাবক্তা জেনে শ্বশুরমশায় কতটা আহ্লাদিত হয়েছিলেন, তবে মাথা নিচু করে একটা কথা কবুল করতে চাই অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাবলীল রচনাশৈলী আমার হাতে নেই, তাঁর অবিস্মরণীয় কাহিনীটি আমার নিতান্ত খোলা ভাষায় কেমন খুলিয়ে দিলাম।

বছর কুড়ি আগের কথা মনে পড়ছে। আমার ছেলে তাতাই নতুন বছরে জানুয়ারি মাসে সদ্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সেই তখন থেকেই শিশুদের বইয়ের বোঝা বাড়তে শুরু করেছে। বিশাল বুকলিস্ট মিলিয়ে একদিন বইপাড়ায় সেই শীতের সন্ধ্যায় দোকানে দোকানে ঘুরে সর্বস্বান্ত এবং সেই সঙ্গে ঘর্মাক্ত হয়ে ট্যাক্সি করে বইয়ের পাহাড় নিয়ে এলাম।

আমার মা তখন কলকাতায় আমার কাছে রয়েছেন। বইয়ের বহর দেখে মা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, 'এই এতটুকু ছয় বছরের ছেলে তাতাই, অত বই পড়বে কী করে।'

উকিল বাড়ির বউ, শ্বশুর-ভাসুর-স্বামী সবাই উকিল। বড় মোটা বই, কাঠের তাকে সারি সারি লাল চামড়ায় বাঁধানো মোটা বই মা জীবনে কম দেখেননি। কিন্তু আজ শিশু-পৌত্রের জন্য বইয়ের পরিমাণ দেখে মা বিচলিত বোধ করেন।

সৌভাগ্যের কথা, তাতাই যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, সেই স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মা-র পরিচিতা। তাঁকে তিনি নাম ধরেই ডাকতেন। পরের দিন তাতাইয়ের সঙ্গে স্কুলে গিয়ে মা ওই বড় দিদিমণিকে বললেন, "দ্যাখো বিরজা, তোমরা আমার দুধের শিশু ছয় বছরের নাতিকে অতগুলো বই পড়তে দিয়েছ, ও তো অত বই পড়ে উঠতে পারবে না। পড়া না পারলে ওকে কিন্তু মারতে পারবে না। ও আমার একমাত্র নাতি। যদি দ্যাখো যে একেবারেই পড়া করে আসেনি ভয় দেখানোর জন্যে ওর পাশের কোনও ছেলেকে মেরো, তা হলেই ও শুধরে যাবে।'

পরে বিরজাদি আমার কাছে আক্ষেপ করেছিলেন, 'দ্যাখো রেণুদির কী কথা! তোমার ছেলে দোষ করলে অন্য ছেলেকে মারব, এ হতে পারে?'

তবে সব কিছুরই একটা ভাল দিক থাকে। সেদিন কোথায় যেন শুনলাম এক উজ্জ্বল, গৌরবময় ভবিষ্যৎ বাণী। দু হাজার সালে, মানে পনেরো বছর পরে শিকাগো না সাংহাই কোথায় যেন অলিম্পিকে ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ছেলেদের এবং মেয়েদের গ্রুপে প্রথম তিনজনই বাঙালি। দুই গ্রুপেই সোনা-রুপো-তামা সব মেডেলই তারা পেয়েছে। সেই বিশ্ব-অলিম্পিকে বাঙালিদের তথা ভারতীয় দলের জয়-জয়কার।

কী ব্যাপার? কী করে এটা সম্ভব হল?

একটু খোঁজ নিতে জানাল আগের শতকের শেষ দশকের গোড়াতে, অর্থাৎ এই এখনকার সময়ে, উনিশশো নব্বুই-বিরানব্বুইতে এই সব ছেলেমেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ছিল। সেই শিশু বয়স থেকে পর্বতপ্রমাণ বই-খাতার বোঝা টেনে টেনে এরা ভারোত্তোলনে অচিন্ত্যনীয় দক্ষতা অর্জন করেছে।

তবে শিশুশিক্ষার ব্যাপারটা যে সব সময় আকার প্রকারে বড় তা নয়। কবি মণীন্দ্র রায়ের কাছে একটা মজার গল্প শুনেছিলাম।

মণীন্দ্রবাবু একদিন ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ পড়ছেন এমন সময় উপরের ফ্ল্যাট থেকে সে বাড়ির বুড়ো কর্তার চিৎকার, চেঁচামেচি শুনতে পেলেন। কী ব্যাপার অনুধাবন করার জন্যে একটু কান পাততেই শুনতে পেলেন, 'এই ওপরে ওঠা, আরেকটু ওপরে, আরেকটু, আর না, আর না, এবার বাঁয়ে, হ্যাঁ, আরেকটু বাঁয়ে, সোজা নয় কাত করে, অনেকটা কাত করে, এইরকম প্রায় আধঘণ্টা চলল। মণীন্দ্রবাবু বুঝতে পারলেন ঘরে খাট-আলমারি জাতীয় ভারী জিনিসপত্র কিছু সরানো হচ্ছে। মালপত্র টানাটানি করছে, তারই নির্দেশাবলী।

কিন্তু পরের দিন সকালে, আবার সেই একইরকম ধস্তাধস্তি, চিৎকার-চেঁচামেচি, 'আরেকটু বাঁয়ে, এবার সোজা, তারপর ডাইনে, আরেকটু, আরেকটু,' ইত্যাদি।

আজ মণীন্দ্রবাবু একটু বিস্মিত হলেন, ওই ফ্ল্যাটে প্রতিদিনই মালপত্র টানাটানি হচ্ছে নাকি।

এর পরে তৃতীয় দিনেও যখন একই ব্যাপার ঘটল মণীন্দ্রবাবু সোজা উঠে গেলেন ওপরের ফ্ল্যাটে। বেল টিপতে বুড়ো কর্তা নিজেই দরজা খুললেন, তাঁর হাতে একটা চক পেন্সিল। ঘরের মেঝেতে একটি বাচ্চা ছেলে উবু হয়ে স্লেট নিয়ে বসে রয়েছে।

একটু ইতস্তত করে মণীন্দ্রবাবু বললেন, 'আমি ভাবছিলাম আপনি বুঝি বাড়ির মধ্যে আসবাবপত্র এদিক-ওদিক টানাটানি করছেন। প্রত্যেকদিনই ব্যাপারটা হচ্ছে কি না, তা ভাবলাম একটু খোঁজ নিই।

বুড়ো কর্তা হেসে বললেন, 'না, না। আসবাবপত্র আর কি টানাটানি করব এই ছোট ফ্ল্যাটের মধ্যে। তা নয়। ওই ছোট নাতিটাকে একটু অ-আ লেখা শেখাচ্ছি। এ-ও কম কঠিন ব্যাপার নয়, চেঁচাতে চেঁচাতে একদম ঘেমে গেছি মশায়।'

পুনশ্চ :

পিতামহ যতই চিৎকার করুন, পিতামহী যতই প্রশ্রয় দিন, বিদ্যালয় বইয়ের ভার আর খাতার বোঝা যতই বাড়াক শিশুরা কিন্তু শিশুই থাকবে।

সাতসকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলে টানা লম্বা ক্লাস করে, তারপর স্কুলবাসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পাক খেয়ে ক্লান্ত শিশু ভরসন্ধেয় বাড়ি ফিরে হোম টাস্ক নিয়ে বসুক, ঘুমে জড়িয়ে যাক তার ম্লান চোখ। ছুটির দিনে তাকে পাঠানো হোক নাচের কিংবা গানের স্কুলে কিংবা নিতান্ত ছবি-আঁকার আখরায়। সে 'টুইংকল টুইংকল লিটল স্টার'

আবৃত্তি করুক চার বছর বয়েসে, সে পৃথিবীর ইতিহাস মুখস্থ করুক দশ বছর বয়েসে, সে গোরুর বিষয়ে লিখুক রচনাই মুখস্থ করে, গাছ-গাছালি চিনুক উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বই পড়ে। তবু তার আসল শৈশব, তার শিশুত্ব আমরা কেড়ে নিতে পারব না।

বেশি তত্ত্বকথায় না গিয়ে একটা সম্প্রতি শোনা গল্প দিয়ে শেষ করি এই দুঃখের বৃত্তান্ত।

একটি পাঁচ বছরের শ্যামলা মেয়ে, তার মা-বাবা দুজনেই কালো। সে জ্ঞান হওয়া থেকে শুনে আসছে, মাসি-পিসি, পাড়া-প্রতিবেশী বলছে, 'মেয়েটা খুব কালো হয়েছে। ও কী আর করবে, ওর মা-বাপ দুজনেই কালো।'

সেই মেয়েকে নার্সারি ক্লাসে দিদিমণি জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কাক কালো কেন ?'

মেয়েটি একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল, 'কাক কী আর করবে ? ওর মা-বাবা দুজনেই যে কালো।'

এরপরে আরও একটা হালকা গল্প আছে। সেটা না বলা পাপ হবে।

কলকাতার একটি বাংলা স্কুলে একটি মেয়ে ভর্তি হয়েছে, সে ভাল বাংলা বলতে পারে না। সে জন্মেছিল এলাহবাদে সেখান থেকেই তার বাবা বদলি হয়ে সম্প্রতি এই শহরে এসেছেন।

সেদিন দিদিমণি ক্লাসে কী একটা লিখতে দিয়েছেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ করলেন যে, এই মেয়েটি, যার নাম সরমা, সে কিছু লিখছে না।

দিদিমণি সরমাকে বললেন, 'কী হল, তুমি লিখছ না কেন ?'

সরমা বলল, 'আমার পেন্সিল না আছে।'

সরমার মুখে এরকম বাক্য শুনে দিদিমণি তাকে শুধরানোর জন্যে বললেন, 'আমার পেন্সিল না আছে আবার কী কথা হল। আমার পেন্সিল নেই, তোমার পেন্সিল নেই, আমাদের পেন্সিল নেই, তোমাদের পেন্সিল নেই। বুঝলে।'

সরমা অভিভূত হয়ে বলল, 'আজ সকলেরই পেন্সিল কেন না আছে ?'

লা জবাব

লা জবাব।

মানে জবাব নেই। মানে জবাবের মতো জবাব। যার উত্তরে আর কিছু বলা চলে না। যেমন জুতোর বাক্সে একজোড়া জুতো, মুখে মুখে কানে কানে ফিট করে গিয়েছে।

একটা সাদামাটা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে শুরু করি।

দক্ষিণ কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের উলটো দিকে, কিন্তু রাসবিহারী এভিনিউ এবং শরৎ বসু রোডের মোড়ে একটি পুরনো দিনের রেস্তোরাঁ আছে। এই রোস্তোরাঁয় কখনও এক কাপ চা খাননি, কিছুক্ষণ আড্ডা দেননি এমন কৃতবিদ্য ব্যক্তি বোধহয় কলকাতা শহরে নেই।

বেকার ও মাস্টার, কেরানি ও আমলা, কবি ও ভবঘুরে, শিল্পী ও ঠগী কত রকমের লোক যে দেখেছি ওই সুতৃপ্তিতে। ছুটির দিনে ভিড় উপচিয়ে পড়ত রাস্তায়। কথায় হাসিতে গমগম করত রাস্তার মোড়। আমাদের প্রথম যৌবনের ছুটির দিনের সোনালি সকালগুলো কেটেছে এই সুতৃপ্তিতে। রকের আড্ডা, কফিহাউস আর আলাদিটোলা একত্রে ভাল করে মিলিয়ে তিন ভাগ করলে তার এক ভাগ হল সুতৃপ্তির আড্ডা।

লা জবাবের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ দেখেছিলাম এই আড্ডায়।

খুব ইংরেজি চর্চা হত সুতৃপ্তিতে। সবাই ভাবত তার মতো ইংরেজি আর কেউ জানে না। দুয়েকজন যে ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়, কেউ কেউ বলত একমাত্র তার পূজ্যপাদ শ্বশুরমশায় ছাড়া আর কেউ তার মতো ইংরেজি জানে না। সে যা হোক একদিন তর্ক লাগল ইংরেজি বানান নিয়ে। যা হয় শেষ পর্যন্ত তর্ক গিয়ে ঠেকল দু'জনের মধ্যে। সেই দুজনই এখন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি, নামের আদ্যক্ষর বললেও সবই বুঝে ফেলবেন। এই খণ্ড কথিকায় আমি এদের নামকরণ করছি বীজগণিতের ভাষায় মিস্টার এক্স এবং মিস্টার ওয়াই (Mr. X and Mr. Y)।

আলোচনা উত্তপ্ত হতে হতে এমন জায়গায় এসে পৌঁছাল যে প্রায় স্কুলের ছাত্রের মতো মিস্টার এক্স মিস্টার ওয়াইকে চ্যালেঞ্জ করে বসল, 'পারবি ? এই ইংরেজি শব্দটার বানান করতে পারবি ?' বলে কী একটা খটমট ইংরেজি শব্দ বলল।

উত্তেজিত ওয়াই বলল, 'তুই পারবি ?'

এক্স বলল, 'পারব বলেই প্রশ্ন করছি।'

সহসা দুম করে ওয়াই বলে বসল, 'তুই পারবি না। তোর বাবাও পারবে না।'

এই ধরনের আক্রমণে আড্ডার সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু এক্স ব্যাপারটা নরম করে দিল, সে শান্ত করুণ কণ্ঠে বলল, 'ভাই, এর মধ্যে আবার আমার বাবাকে টেনে আনছিস কেন ? তিনি তো কবেই মারা গেছেন।'

এর উত্তরে ফস করে ওয়াই যা বলল তার কোনও জবাব নেই, সেই উত্তর আমরা আজও ভুলিনি।

ওয়াই বলে বসল, 'ওই বানান করতে গিয়েই তোর বাবা মারা গেছে।'

রেস্তোরাঁর মধ্যে যেন বজ্রাঘাত হল। সেদিনের মতো আড্ডা ভেঙে গেল। সাড়ে তিন মাস এক্স এবং ওয়াই পরস্পরের কথা বলল না।

এই সুতৃপ্তিতেই এক অকবির মুখে এক সুন্দরীর বর্ণনা শুনেছিলাম। একটি প্রতিবেশী যুবতীর কথা সে বলছিল। সে এমন সুন্দরী যে সানগ্লাস অর্থাৎ কালো চশমা চোখে না নিয়ে তাকে দেখলে চোখ ঝলসিয়ে যাবে।

এই বর্ণনাও অবশ্যই অতুলনীয়।

যাকে বলে জবাব নেই।

লা জবাব। যার পর আর কথা বলা চলে না। এরকম এমন অনেক কথা আছে, যার সত্যি কোনও জবাব নেই। সেটাই সে বিষয়ে শেষ কথা।

আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক তাঁর পুরনো কলেজের রজতজয়ন্তী পুনর্মিলন উৎসবে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বললেন, 'সকলের মাথায় টাক পড়ে গেছে, সকলেই মোটা হয়ে গেছে, কেউই আমাকে চিনতে পারল না।'

এ ব্যাপারে ওই ভদ্রলোককে কেউ বোঝাতে পারবে কি যে আপনি নিজে মোটা হয়ে গেছেন। আপনার মাথায় বিশাল টাক পড়েছে, তাই আপনাকে তারা চিনতে পারেনি। তাদের টেকো কিংবা মোটা হওয়ার সঙ্গে আপনাকে চিনতে না পারার কোনও সম্পর্ক নেই।

অন্য এক ভদ্রমহিলার কথা জানি, যিনি খুব গোয়েন্দা কাহিনীর ভক্ত। তিনি সমস্ত রহস্য কাহিনী মধ্যের পাতা থেকে পড়তে আরম্ভ

করেন, সামনের অর্ধেক পাতা ছেড়ে দিয়ে। মহিলাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'রহস্য' কাহিনীর শেষে কী আছে তা নিয়ে সবাই মাথা ঘামায়, আমি শুধু শেষ নয় শুরুতে কী ছিল তা নিয়েও মাথা ঘামাই। একটা বই পড়ে ডবল বই পড়ার উত্তেজনা অনুভব করি।'

লা এবং জবাব এই দুটি শব্দই আরবি। উর্দু ভাষাতেও শব্দ দুটি চালু আছে।

লা মানে নেই, জবাব মানে উত্তর।

জবাব শব্দটি অবশ্য বহুকাল আগেই বাংলা ভাষায় ঢুকে গেছে এবং খাঁটি বঙ্গীয় হয়ে গেছে। যেমন, 'ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে', এখানে জবাব শব্দের আলাদা অর্থ, মানে রোগীটি আর বাঁচবে না। আবার মনিব জবাব দিয়েছেন, অর্থাৎ চাকরিটি গেছে ; এখানে জবাব শব্দের অর্থের অন্য ভঙ্গি।

আর উত্তর অর্থে জবাব, চিঠির জবাব, তার চমৎকার ব্যবহার আছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়।

'এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,
আপাতত এটা দেরাজে দিলেম রেখে।
পারো যদি এসো শব্দবিহীন পায়,
চোখ টিপে ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে।'

প্রেমের কবিতার পরেই আদালতে যেতে হচ্ছে। আদালতি ভাষায় একটি পুরনো শব্দ সেই নবাব আমল থেকে রয়েছে, শব্দটি হল জব। জব শব্দটি ফার্সি, আরবি শব্দ জবাবেরই ফার্সি সংস্করণ।

আদালতে বাদীপক্ষ মামলা দায়ের করে। তাদের আবেদনের বিরুদ্ধে বিবাদী পক্ষের জবাব চাওয়া হয়। এই জবাবই হল জব, উকিলেরা মক্কেলের কথা শুনে জব তৈরি করেন।

সবাই জানেন আমি বিদ্যাদিগগজ নই, আর ভাষাতত্ত্ব তো জটিলতম বিষয়, সুতরাং এখানেই তত্ত্বের ইতি। বরং এই সূত্রে পাঠকদের এবং অবশ্যই পাঠিকাদের একটা গোপন খবর দিচ্ছি। তবে সবাইকে নয়, শুধু তাঁদের যারা সদাসর্বদা মুখের মতো জবাব দিতে চান ; চমকপ্রদ, লাগসই লা-জবাব জবাব।

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত একটি মার্কিনি বই, অবশ্য বইয়ের নামেই তা মালুম, 'টু থাউজান্ড ইনসাল্টস' অর্থাৎ 'দু-হাজার অপমান'। সঙ্কলকের নাম লুইস সফিয়ান। প্রকাশক বিখ্যাত

পেঙ্গুইন কোম্পানির সহোদর ভ্রাতা 'পকেট বুকস', যাদের প্রতীক সেই একই পেঙ্গুইন পাখি।

'দু-হাজার অপমানের পাতায় পাতায় ঝলমল করছে কিংবা কাব্য করে বলা যায় কালো মেঘের মধ্যে বিদ্যুল্লেখার মতো ঝিলিক দিচ্ছে শ'পাঁচেক জবাবের মতো জবাব, বাকি দেড় হাজার তেমন জুতসই হয়নি। হওয়া সম্ভবই নয়। স্বয়ং তারাপদ রায় একেক সময় ফেল মেরে যান লুইস সফিয়ান সাহেব তো তুচ্ছ বানানান্তরে তুচ্ছ (চলন্তিকাকার রাজশেখর কৃত পরশুরামীয় বানান)।

তবে একটা শিরোধার্য কথা বলি, বিনা তর্কে সেটা স্বীকার করে নিতে হবে এই দু হাজার অপমানের বইতে অন্তত দশ-পনেরোটা এমন বাক্য আছে যা সত্যি সত্যি লা জবাব।

দুয়েকটা উদাহরণ না দিলে অন্যায় হবে।

এর মধ্যে কয়েকটি মর্মান্তিক, তাই দিয়েই শুরু করা যায় :—

(১) তুমি কোটিপতি হয়ে যাবে যদি গবেন্দ্রের যা দাম তুমি মনে ভাবছ সেই দামে কিনতে পারো আর গবেন্দ্র তার নিজের যা দাম ভাবছে সেই দামে তাকে বেচতে পারো।

(২) তুমিই কি সেই ব্যক্তি, যে নিজের জন্মদিনে নিজের বাবা-মাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলে ?

(৩) সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন তুমি জানতে পারবে পিঠ চাপড়ানির থেকে পাছায় লাথি মারার দূরত্ব মাত্র এক ফুট।

(৪) চামেলিবালার জীবনের শ্রেষ্ঠ দশ বছর ছিল তাঁর উনচল্লিশ আর চল্লিশ বছরের মধ্যে।

(৫) চামেলিবালা ইচ্ছে করলেই জীবনকে লম্বা করতে পারেন সত্যি কথা বলে, যদি নিজের আসল বয়েসটা পরিষ্কার করে বলেন তা হলেই হয়ে যাবে।

(৬) মদ্যপেরা কখনও ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে না, কারণ তারা জানে বৃদ্ধ ডাক্তারের চেয়ে বৃদ্ধ মদ্যপের সংখ্যা অনেক বেশি, মাতালেরা ডাক্তারদের চেয়ে দীর্ঘজীবী হয়।

এই উদাহরণমালা দীর্ঘ করা অবান্তর হবে। এবার দুয়েকটা লা-জবাব কাহিনীর সন্ধানে যাই।

এক প্রৌঢ়া মহিলার ডান পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। যন্ত্রণায় মাটিতে পা ফেলতে পারেন না। অথচ হঠাৎ এ রকম যন্ত্রণা হওয়ার কোনও কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

বাধ্য হয়ে মহিলা ডাক্তার দেখালেন। ডাক্তারবাবু ভাল করে

দেখে, নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপর ওষুধ দিলেন। মহিলা ডাক্তারবাবুর কাছে জানতে চাইলেন, 'ডাক্তারবাবু আমার ডান পায়ের এই সাংঘাতিক ব্যথাটা কেন হল ?'

বলা বাহুল্য, ডাক্তারবাবু নিজেও সেটা ধরতে পারেননি। তিনি প্রশ্নটার পাশ কাটিয়ে জবাব দিলেন, 'বয়েস বাড়ছে তো, একটু-আধটু এরকম হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঝটিতি প্রশ্ন করলেন সেই প্রৌঢ়া মহিলা। 'কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমার বাঁ পা আর ডান পা দুটোই সমবয়সী। দুটো পা একসঙ্গে জন্মেছে, কেউ আগে পরে জন্মায়নি। তা হলে আমার বাঁ পায়ে ব্যথা না হয়ে ডান পায়ে ব্যথা হল কেন ?'

দুঃখের বিষয় ডাক্তারবাবুর কাছে এ প্রশ্নের কোনও জবাব ছিল না।

অতঃপর কয়েকটি লা-জবাব কথোপকথন চাই। এর মধ্যে এক-আধটি বহু পরিচিত, রীতিমতো বিখ্যাত।

এক নাস্তিক বলেছিলেন, 'আমি যা চোখে দেখতে পাই না, তা আমি বিশ্বাস করি না। ভগবানকে দেখিনি, তাই আমি ভগবান বিশ্বাস করি না।'

এই শুনে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি জবাব দিয়েছিলেন। 'তোমার মাথার ঘিলু আমি চোখে দেখতে পারছি না। সুতরাং এ কথা বলতে পারি কি যে তোমার মাথায় ঘিলু আছে তা আমি বিশ্বাস করি না।'

এদিকে এক নর্তকী অহঙ্কার করে এক সাংবাদিককে বলেছিলেন, 'বুঝলেন, নাচ আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে।' এই শুনে সপ্রতিভ সাংবাদিক বলেছিলেন, 'তা হলে তো ম্যাডাম আপনার শরীরে রক্তচলাচল ব্যবস্থা খুবই খারাপ। নাচের রক্ত আপনার পা পর্যন্ত পৌঁছায়নি।'

একটু আমার নিজের কথাও বলি।

একদা আমার এক সুহৃদ আমাকে খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি সারা জীবন টাকার জন্যে হা-পিত্যেশ লড়াই করে যাচ্ছ।'

আমি আহত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর তুমি ?'

সে নাক উঁচু করে জানাল, 'চিরকাল আমার লড়াই আত্মসম্মানের জন্যে।'

আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না, সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'দ্যাখো, যার যা অভাব আছে, সে তারই জন্যে লড়াই করে।'

আরেকবার আমার এক চতুরা পাঠিকা, প্রায় অশিক্ষিতা চালবাজ

এক চিত্রতারকার সঙ্গে এক নৈশ পার্টিতে দেখা হয়েছিল। পূর্বপরিচিতা ওই সুন্দরী মহিলা কিঞ্চিৎ নেশা করার পর আমার ঘাড়ে এসে পড়লেন।

কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ বলে বসলেন, 'আপনার নতুন বইটা আমি পড়েছি। বইটা খারাপ নয়। কিন্তু, বইটা নিশ্চয় আপনার লেখা নয়। অন্য কেউ আপনার হয়ে লিখে দিয়েছে।'

কথাটা বলেই টলমল পদে মহিলা বিদায় নিচ্ছিলেন, আমি তাঁর পথ আটকিয়ে বললাম, 'আপনি বই পড়েছেন ? আপনি বই পড়তে পারেন ? নিশ্চয়ই আপনাকে কেউ পড়ে শুনিয়েছে।'

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, এ রকম অভদ্রতা করা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কিই বা করার ছিল ?

অনেকে অবহেলা করার চেষ্টা করেন। হয়তো বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলাম। ইচ্ছে করে এলেন না। পরে দশজনের সামনে বড় গলায় বললেন, 'সেদিন আপনার বাড়ির নেমন্তন্নের ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। দুঃখিত, যাওয়া হয়নি।'

সে তো আমি জানি। কিন্তু আমাকেও তো কিছু করতে হবে। বাধ্য হয়ে বললাম, 'সে কী আপনি আসেননি নাকি ? আমি তো খেয়ালই করিনি।'

না। নিজেকে নিয়ে আর নয়। এবার একটা পরিষ্কার গল্প বলে লা-জবাবের ইতি টানি।

গল্পটা যথারীতি জনৈকা চপলা অভিনেত্রীকে নিয়ে। তিনি একদিন তাঁর প্রেমিককে বললেন, 'দ্যাখো, আমাদের বিয়েটা কিছুদিন স্থগিত রাখতে হবে। আপাতত অল্প কিছু দিন।'

শুনে সে প্রেমিকের মাথায় হাত, 'সে কী, সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। হল ভাড়া করা হয়ে গেছে। ক্যাটারারকে অ্যাডভান্স করা হয়েছে, ডেকরেটরকেও বায়না দেওয়া হয়েছে। আজ কালের মধ্যে চিঠি ছাপতে যাবে।'

অভিনেত্রী বললেন, 'এখন চিঠিফিটি ছাপতে যেয়ো না। কিছুদিন সবুর করতে হবে।'

'কিন্তু কেন ?' প্রেমিক অধীর হয়ে উঠলেন।

অভিনেত্রী বললেন, 'কী আর করব বলো ? আমি যে কাল রেজিস্ট্রি করে আমার প্রডিউসার ঝুনঝুনওয়ালাকে বিয়ে করে ফেলেছি। এখন যে কিছুদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

এর পর সেই হতভাগ্য প্রেমিক কী বলেছিলেন তা আমাদের জানা

নেই। আর জেনেই বা কি লাভ ? সব কিছুর কি জবাব থাকে ?

পুনশ্চ :

(ক) বেশি কথা বলো না। কথাই বলো না। মুখ খুলো না।

পরম কৃপাময় ভগবান তোমাকে নাক দিয়েছেন নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে, যাতে তোমাকে মুখ খুলতে না হয়।

(খ) তোমাকে দেখলে বুঝতে পারি, ডারউইন সাহেব একটু এগিয়ে আছেন, বাঁদর থেকে মানুষে পরিণত হওয়া এখনও ঠিকমতো শুরু হয়নি।

এই দুটি বাঁধিয়ে রাখার মতো বাক্যবাণ 'দু-হাজার অপমান' নামক তুনীর থেকে ছুঁড়ে এ যাত্রা যুদ্ধ শেষ।

চোর

'গলি গলি মে শোর হ্যায়।
এক্স-ওয়াই-জেড চোর হ্যায়।'

উত্তরভারতীয় গ্রামে ও নগরে এই শ্লোগান বহুকাল চলছে। কখনও এই শ্লোগানের এক্স-ওয়াই-জেড স্থানীয় পঞ্চায়েত-প্রধান, বিধায়ক বা সাংসদ, কখনও-বা খোদ মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী। এ-সব রাজনৈতিক ব্যাপার, কাদা-ছোড়াছুড়ি—আমরা এর মধ্যে যাব না। আমাদের কাজ আসল চুরির ব্যাপার নিয়ে।

চুরি খুবই প্রাচীন নেশা। মানুষের সমাজে যে-দিন থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা হয়েছে, সে-দিন থেকেই চৌর্যবৃত্তি শুরু হয়েছে। কোরানে-বাইবেলে, রামায়ণ-মহাভারতে—সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে চুরি ও চোরের কথা আছে। সব ধর্মেই বলেছে, চুরি করা মহাপাপ। খ্রিস্টানদের দশটি অনুশাসনের মধ্যে একটি হল চুরি না-করার আদেশ।

চোর নানা রকমের। সিঁদেল চোর, ছিঁচকে চোর থেকে শুরু করে গরু চোর, জোচ্চোর, পুকুর-চোর পর্যন্ত। প্রতিটি রকম চুরির ক্ষেত্রেই যথেষ্ট পেশাদারি দক্ষতা লাগে। গরু চুরির পদ্ধতিতে কেউ যদি ঘোড়া চুরি করতে যায়, সে নিশ্চয় ধরা পড়ে যাবে। যে অন্যের বউ চুরি করে, সে যতই মোলায়েম, মধুরভাষী হোক, তার দ্বারা

দিনে-দুপুরে ডাহা পুকুরচুরি করা সম্ভব না-ও হতে পারে।

দিনদুপুরে চুরির গল্প জোচ্চুরি পর্যায়ে ইতিমধ্যে বলেছি, আরেকটি এইমাত্র মনে পড়েছে, সেই গল্পটা লিখে আসল চোর, রাতদুপুরের চোরের কথায় যাব।

পাঁড়াগায়ের গল্প। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি ছাগল পুষতেন। ছাগলটি তাঁর নয়নের মণি। ছাগলটির গলায় তিনি একটি কাঁসার ঘণ্টা লাগিয়ে দিয়েছিলেন যাতে যখন যে-দিকে ছাগলটা ঘুরতে-ফিরতে চলে যাক, গলার ওই ঘণ্টার শব্দটা তিনি শুনতে পান এবং ঘণ্টার শব্দ অনুসরণ করে ছাগলটিকে খুঁজে বার করতে পারেন।

দুঃখের বিষয়, একদিন ছাগলটা ঘরে ফিরে এল, কিন্তু বৃদ্ধ ঘণ্টার টুংটাং শব্দ শুনতে পেলেন না। ছাগলের গলার দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, সেখানে ঘণ্টাটা নেই। বৃদ্ধের খুবই মন খারাপ হয়ে গেল। হাটে ছাড়া এ-সব জিনিস পাওয়া যায় না, আবার হাটে গিয়ে আর-একটা ঘণ্টা কিনে আনতে হবে।

এমন সময় পাড়ারই একটি ছেলে এল সেই ঘণ্টাটি নিয়ে ; সে বলল, 'সামনের মাঠে ঘাসের মধ্যে পড়ে ছিল। ওখানে একটু আগে আপনার ছাগলটা চরছিল, তাই ভাবলাম এই ঘণ্টাটা এই ছাগলটার গলার।'

বৃদ্ধ ঘণ্টা ফেরত পেয়ে খুব খুশি। তাড়াতাড়ি দেরাজ থেকে একটি টাকা বের করে ছেলেটিকে পুরস্কার দিলেন।

দিন সাতেক পরে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। ছাগলের গলার ঘণ্টাটি হারাল। ছেলেটি সেটি কুড়িয়ে পেয়ে বৃদ্ধকে এনে দিল। বৃদ্ধ তাকে এক টাকা উপহার দিলেন।

ফলত স্বাভাবিকভাবেই এই একই ঘটনা তৃতীয়বার ঘটল কয়েকদিনের মধ্যেই। ঘণ্টাটি হাতে নিয়ে বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুমি হয়তো প্রথমবার ঘণ্টাটা কুড়িয়ে পেতে পারো, কিন্তু বারবার তিনবার ! অসম্ভব ! তুমি একটি পাকা চোর।'

এবার দুপুর-রাতের চোরের গল্প।

মধ্যরাতে চোর এসেছে এক কবির বাড়িতে। কবির নাম আছে বেশ, কিন্তু অর্থ নেই ; সম্প্রতি নিতান্ত কপর্দকশূন্য অবস্থা।

মধ্যরাতে কবির ঘুম ভেঙে গেল, চোখ খুলেই বুঝলেন যে, ঘরের মধ্যে আরও কেউ আছে, তারপর দেখলেন যে একটা লোক একটা পেন্সিল-টর্চ দিয়ে ছোট করে আলো ফেলে বাক্স, আলমারি, টেবিলের ড্রয়ার সব হাতড়িয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে কবি আর হাস্য সংবরণ

করতে পারলেন না, হো-হো করে সশব্দে হেসে উঠলেন।

একে বহু চেষ্টা করেও একটি পয়সার নাগাল এখনও পর্যন্ত পায়নি চোর বেচারি, তার ওপরে এই মর্মান্তিক উচ্চহাসি, সে রীতিমতো রুখে দাঁড়াল, 'হাসার কী হয়েছে ? হাসছেন যে বড় ?'

কবি বললেন, 'ভাই, শুধু-শুধু হাসছি না। যে বাক্স, আলমারি, ড্রয়ারের মধ্যে দিনের আলোয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুঁজেও আমি একটিও পয়সা পাইনি, সেখানে রাতের অন্ধকারে একটি ছোট আলো জ্বালিয়ে পয়সা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। বড় দুঃখে হাসছি, তস্করজি ! তার চেয়ে বরং টর্চের আলোটা এ-দিকে ফেলুন, খাতা খুলে একটা কবিতা শোনাই আপনাকে।'

পয়সা না-পাওয়ার দুঃখেই হোক অথবা কবিতা শোনার ভয়েই হোক, কবির তস্করজি সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুমাত্র দেরি না করে, অস্ফুট স্বরে, দাঁত পিষে কী-একটা অকথ্য গালাগাল ছুঁড়ে দিয়ে ভগ্ন গবাক্ষপথে অন্তর্হিত হলেন।

পুনশ্চ :

কবরখানার সামনের রাস্তা থেকে একটা গাড়ি চুরি করেছিল এক চোর। তাকে পুলিশ ধরে আদালতে চালান দিল। আদালত চোরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি গাড়িটা চুরি করতে গেলে কেন ?' চোর করজোড়ে বলল, 'হুজুর, কবরখানার সামনে গাড়িটা দেখে আমার মনে হয়েছিল, গাড়িটার মালিক বোধহয় আর নেই, কবরের নীচে গেছে।'

বই ও বইমেলা

আবার বইমেলা।

বইমেলা এখন দোল-দুর্গোৎসবের মতো অনিবার্য হয়ে উঠেছে। শারদীয় কিংবা শুভ নববর্ষের অনুষ্ঠানের মতোই বিজ্ঞাপনের ভাষায় বঙ্গজীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং বইমেলায় পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বেরোবে, এবং তার জন্যে হালকা লেখার সুবাদে আমারও অল্পবিস্তর ডাক আসবে সে তো জানা কথা।

কিন্তু বছর বছর কাগজে কাগজে বই নিয়ে নতুন রসিকতার জোগান আমি দেব কী করে।

কী একটা প্রবাদ আছে পুরানো কাসুন্দি নিয়ে, কথাটা বোধ হয় পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। কিন্তু তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার তো তা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সুতরাং পুরানো রসিকতাতেই ফিরে যাচ্ছি। তবে নিজের রসিকতায় যাওয়ার পথে প্রাতঃস্মরণীয় সৈয়দ মুজতবা আলীকে ছুঁয়ে যাই।

মুজতবা সাহেবের কাহিনীর নায়িকা তাঁর স্বামীর জন্মদিনে একটা উপহার কিনতে গেছেন একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। ভদ্রমহিলা ঘুরে ঘুরে দোকানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জিনিস খুঁটিয়ে দেখছেন কিন্তু কিছুই তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। স্টোরের ম্যানেজার কিঞ্চিৎ দূর থেকে ভদ্রমহিলার ভাবগতিক লক্ষ রাখছিলেন। একটি অতি সুদৃশ্য কাঠের তৈরি পেপারওয়েট মহিলা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। ম্যানেজারবাবু ভাবলেন এত সুন্দর জিনিসটা পছন্দ না হয়ে যায় না।

কিন্তু ভদ্রমহিলা সেটাও বাতিল করলেন। এবার ম্যানেজারসাহেব আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। নিজে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'পছন্দ হচ্ছে না।'

ভদ্রমহিলা তাঁর যা প্রয়োজন, তিনি যে তাঁর স্বামীর জন্মদিনের উপহার কিনতে এসেছেন সেটা ম্যানেজারসাহেবকে বুঝিয়ে বললেন।

তিনি যে পেপারওয়েটটা এতক্ষণ দেখছিলেন ম্যানেজার সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রশ্ন করলেন, 'ওটা পছন্দ হল না।'

ভদ্রমহিলা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না ঠিক এইরকম ডিজাইনের একটা শ্বেতপাথরের কাগজ চাপা ওর আছে।'

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ঝানু ম্যানেজার এত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নন। এবার তিনি মহিলাকে পোশাক বিভাগে নিয়ে গিয়ে একটা রঙিন বাটিকের নেকটাই দেখালেন, তাই দেখে মহিলা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, না, বাটিকের টাই ওঁর একটা আছে।'

এবার বাজারে সদ্য আগত নতুন রকম জামার হাতার কাফলিঙ্ক ম্যানেজারবাবু মহিলাকে দেখালেন। সেটাও বাতিল হল, 'ওঁর এরকম আছে।'

ক্রমে ক্রমে যা কিছু সম্ভব, ছাতা থেকে টর্চলাইট, সিগারেট লাইটার

থেকে ঘাসের চপ্পল ঘুরে ঘুরে মহিলাকে ম্যানেজারসাহেব সবই দেখালেন, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এই একই জবাব, 'এরকম ওঁর একটা আছে।'

ঘুরতে ঘুরতে দুজনে পুস্তক বিভাগে এসে পড়েছেন, ম্যানেজারবাবু বইয়ের দিকে দেখিয়ে মহিলাকে বললেন, 'তা হলে একটা বই নিতে পারেন আপনার স্বামীর জন্য।'

এবারেও মহিলা বললেন, 'বই, সেও তো আমার বরের একটা আছে।'

(এই পর্যন্ত মুজতবা সাহেবের, অতঃপর আমার সংযোজনা।)

কিছুকাল পরে ওই ম্যানেজারসাহেব একদিন দেখলেন ওই মহিলা আবার তাঁর দোকানে এসেছেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলেন, 'ম্যাডাম, কী চাইছেন।' ম্যাডাম জানালেন, 'বই।' ম্যানেজারসাহেবের আগের বারের কথা মনে ছিল তাই অবাক হয়ে বললেন, 'কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে, বই তো আপনাদের একটা আছে।'

মহিলা বললেন, 'তা আছে। কিন্তু সেটা আমার স্বামীর বই। গতকাল আমার জন্মদিনে আমার স্বামী আমাকে একটা টেবিলল্যাম্প উপহার দিয়েছেন, সেই টেবিলল্যাম্পে পড়বার জন্যে আমার নিজের একটা বই চাই।'

তবে বই বড় ভাল জিনিস।

বই শুধু পড়ার জিনিস নয়। এই শীতের দুপুরে রোদ্দুরে শুয়ে বই পড়তে পড়তে, সূর্য যখন একটু পশ্চিমে হেলেছে, মুখের ওপর চোখ ঢেকে বই চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন, সানগ্লাস এ কাজ পারবে না। অনেক বেশি আরাম।

কাউকে যদি ছুড়ে মারতে হয়, তবে বইয়ের মতো জিনিস নেই। সঞ্চয়িতা অথবা সি ও ডি-র কথা ভেবে দেখুন কেমন লাগসই অথচ ওই আকারের ইট ছোড়া কত কঠিন। ওজন ও আয়তন বিবেচনায় ছুড়ে মারার পক্ষে বই শ্রেষ্ঠ।

তার পর হয়তো টেবিলের পায়া ভেঙে গেছে, সেখানে নানা মাপের বই সাজিয়ে নিখুঁত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করা যায়। আর সব চেয়ে বড় কথা বইয়ের মতো ঘর সাজানোর জিনিস হয় না। সোনার জলে নাম লেখা চামড়ার বাঁধাই যে কোনও, এমনকি পুরনো পঞ্জিকা দেখলেও মনে সম্ভ্রম জাগে। কাচের আলমারিতে তাকে তাকে সাজানো নতুন ঝকঝকে বই, তার বাহারও কম নয়।

পুনশ্চ :

এ গল্পটা লিখলেও হয়, না লিখলেও হয়। কারণ এটা মোটেই গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। বহুকথিত সত্য ঘটনা।

এই তো সেদিন, মাত্র কয়েকমাস আগে বাড়ি বদল করলাম। যাদের ঝুপড়িতে থাকার কথা তারা যদি বাসায় বা বাড়িতে থাকার চেষ্টা করে তা হলে আস্তানা মাঝেমধ্যে বদলাতেই হয়।

সে সব দুঃখের কথা বলে লাভ নেই। আসল কথাটা বলি।

বাড়ি বদলানোর সময় ট্রাক ভাড়া করতে হয়েছিল জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্যে। আমার জিনিসপত্র বলতে দু-চারটে চেয়ার টেবিল আর কিছু বই। যখন গাদা করে বেঁধে বইয়ের পর বই ট্রাকের ওপরে চাপানো হল, ট্রাক ড্রাইভার ভদ্রলোক খুবই বিরক্তি সহকারে বইয়ের পাহাড় পর্যবেক্ষণ করে তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দাদা, এ বাড়িতে কত দিন ছিলেন ?'

আমি বললাম, 'সে প্রায় বারো বছর।'

ড্রাইভারসাহেব বললেন, 'বারো বছর কম সময় নয়। এই বারো বছরেও বইগুলো সব পড়ে ফেলতে পারলেন না। আবার পরের বাড়িতে নিয়ে যেতে হচ্ছে।'

মনের চিকিৎসা

চিকিৎসার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কোনও রসিকতা করা উচিত নয়। কিন্তু অনেকেই জানেন, বিশেষ করে আমার চিকিৎসকমহোদয়রা জানেন জীবনে কোনও নিষেধই আমি তেমন মানিনি। তা ছাড়া লোকে কি হাসে না, হাসপাতালের ঘরে, ডাক্তারের চেম্বারে, নার্সিংহোমের বারান্দায় ? এমনকি শ্মশানের শবযাত্রীরা পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে পরিহাস করে কখনও কখনও হো-হো করে হেসে ওঠে। শ্মশানের ধোঁয়া-ভরা আমিষ-গন্ধ বাতাসে সেই হাসি বেমানান হলেও বিরল বা অস্বাভাবিক নয়।

চিকিৎসাসংক্রান্ত হাসির আখ্যানগুলির একটি বড় অংশ মানসিক চিকিৎসক নিয়ে।

এই সূত্রে প্রথম যে গল্পটি মনে পড়ছে সেটি এসেছে সরাসরি

উন্মাদ আশ্রমের অভ্যন্তর থেকে। হাসপাতালের সুপারসাহেব একদিন পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে দেখলেন যে তাঁর এক আবাসিক খুব মন দিয়ে কী যেন লিখছেন। তিনি আবাসিককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী লিখেছেন ?' সদ্য-আবাসিক সেই মানসিক রোগী লেখা থেকে বিরত না হয়ে, মাথা না-তুলে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'এই একটা চিঠি লিখছি।'

এর পরে কিছু না বললে খারাপ দেখায় তাই নেহাত সৌজন্যবশত সুপারসাহেব প্রশ্ন করলেন, 'কাকে লিখছেন ?'

এইবার রোগী মুখ তুলে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, 'চিঠিটা আমাকেই লিখছি। আমার তো আমি ছাড়া কেউ নেই।'

সুপারসাহেবের মত পোড়খাওয়া লোক, তিনিও এ রকম দার্শনিক বক্তব্য জীবনে শোনেননি। একটু অবাক হয়ে তিনি বললেন, 'আপনি নিজেকে নিজে চিঠি লিখছেন ?'

পাগলবাবু অমায়িক হেসে বললেন, 'ঠিক তাই।'

তখনই সুপারসাহেব বাধ্য হয়ে বললেন, 'তা হলে আপনি নিজেকে কী লিখলেন।'

এবার হো-হো করে হেসে উঠলেন পাগলবাবু, 'চিঠিটা আগে আমার কাছে আসুক, পড়ে দেখি, তা হলেই তো বলতে পারব চিঠিতে কী লেখা আছে।'

পাগলবাবু চিঠিটা পান, ইতিমধ্যে আমরা অন্য গল্পে ঘুরে আসি। গল্পটি মর্মস্পর্শী।

মনের ডাক্তারবাবুর কাছে এক রোগী এসেছেন, রোগী ভদ্রলোকটি বেশ সম্ভ্রান্ত দেখতে, ফিটফাট, ধোপদুরস্ত জামাকাপড়। যথারীতি ডাক্তারবাবু রোগীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার অসুবিধাটা কী ?' রোগী করুণ কণ্ঠে জানালেন, 'আর বলবেন না স্যার, আমার কাজকর্ম মাথায় উঠেছে, উপার্জন বন্ধ হতে চলেছে।'

ডাক্তারবাবু বলেন, 'কেন, কী হয়েছে আপনার ?' রোগী বললেন, 'আজ কিছু দিন হল কী হয়েছে না লোকজন, ভিড়ভাট্টা দেখলে আমার মাথা রিমঝিম করে, বুক দুরদুর করে, হাত-পা অবশ হয়ে আসে।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'তাতে কী আসে যায় ? যাবেন না ভিড়ের মধ্যে। লোকজন হৈ-হট্টগোল এড়িয়ে চলবেন।' ডাক্তারবাবুর পরামর্শ শুনে রোগী ডুকরিয়ে উঠলেন, 'তা হলে যে সর্বনাশ হবে, আমি ধনে-প্রাণে মারা পড়ব। আমার কারবার মাথায় উঠবে।' রোগীর ওই কাতরোক্তি শুনে ডাক্তারবাবু স্তম্ভিত হয়ে

বললেন, 'কিন্তু কী কারবার আপনার তা তো বললেন না।' রোগী এবার কবুল করলেন, 'স্যার, আমি একজন পকেটমার।'

অন্য এক মানসিক রোগী ডাক্তারকে বলেছিলেন, 'ডাক্তারবাবু, সব সময়ে কেমন অবসন্ন বোধ করি, কেমন যেন ঝিমঝিম ভাব। আমার মনে হয় আমার এমন কিছু দরকার যাতে আমার চনমনে ভাবটা ফিরে আসে। আমার সেই লড়াকু ভাব, যাতে যা কিছু সহ্য হয় না, যা কিছু অপছন্দ করি তা দেখলে রেগে উঠতে পারি, খেপে যেতে পারি। আমাকে এমন একটা ওষুধ দিন যাতে আমি উত্তেজিত হতে পারি।'

ডাক্তারবাবু মৃদু হাসলেন, তার পর বললেন, 'কিন্তু এর জন্যে আপনার কোনও ওষুধ লাগবে না, চিকিৎসাও নয়।' এই কথা শুনে রোগী কিছুক্ষণ ধরে ঝিম মেরে বসে থেকে তার পর মিনমিন করে বললেন, 'তা হলে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনার কোনও ওষুধ চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। আপনি যা যা চাইছেন তার জন্যে আমার বিলই যথেষ্ট।' এই বলে ডাক্তারবাবু ড্রয়ার খুলে বার করে নিজের বিলটার নীচে সই দিয়ে রোগীকে বললেন, 'আমার বিলটা দেখুন। এই বিলটা দেখলেই আপনার ঝিমঝিম ভাব কেটে যাবে। মাথায় রক্ত উঠে যাবে। সারা শরীর চনমনে হয়ে উঠবে। আপনি রেগে উঠবেন, খেপে যাবেন, উত্তেজিত হবেন। আপনার সেই হারিয়ে যাওয়া লড়াকু ভাবটা ফিরে আসবে।' তার পর বিলটা রোগীর হাতে তুলে দিয়ে নরমভাবে বললেন, 'কিন্তু তার আগে অবশ্যই আমার বিলটা মিটিয়ে দেবেন।'

অতঃপর একটি কথোপকথন দিয়ে সাঙ্গ করি। অনিদ্রা বা ইনসোমনিয়ার ওপরে একটি সেমিনার শুনতে গেছেন এক অনিদ্রার রোগী। বিখ্যাত এক মনোচিকিৎসক ইনসোমনিয়ার বিষয়ে বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতান্তে রোগী ও ডাক্তারের মধ্যে এই কথপোকথন :—

রোগী : ডাক্তারবাবু আপনার বক্তৃতা শুনে আমার খুব উপকার হল।

ডাক্তারবাবু : আমার বক্তৃতা আপনার ভাল লেগেছে ?

রোগী : না, ঠিক তা নয়। আসলে আপনার বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অনেকদিন পরে বেশ ভাল ঘুম হল।

হারানো প্রাপ্তি

মানুষ তার এই সামান্য জীবনে কত কী হারিয়ে ফেলে। সে ট্রামে ছাতা হারায়, সকালবেলায় হাঁটতে গিয়ে পার্কে ছড়ি ফেলে আসে, চশমা ফেলে আসে অফিসের টেবিলে। ঘরের চাবি যে কোথায় ফেলে আসে কে জানে ?

সে লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে এসে হারিয়ে ফেলে, বাজারে গিয়ে টাকা হারিয়ে ফেলে। সে হারিয়ে ফেলে পুরনো বন্ধুর ঠিকানা, এককালের প্রাণের বান্ধবীর টেলিফোন নম্বর।

মানুষ কখনও বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে কাণ্ডজ্ঞান। নানারকম উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে। ছাগল হারিয়ে বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল এক গৃহস্থ, তার গল্প তো সকলেরই জানা আছে, আমিও একবার লিখেছি। সেবার বোধ হয় গল্পের ছাগলটা গরু ছিল।

সে যাই হোক, আপাতত এই গৃহস্থের ছাগল হারিয়েছে। বড় প্রিয় দুধালো ছাগল এটা, লম্বা শিং, লম্বা দাড়িওয়ালা আসল রামছাগল। চমৎকার চরছিল বাড়ির সামনের মাঠে, হঠাৎ খুঁটির দড়ি ছেড়ে কোথায় যে চলে গেল।

প্রিয় ছাগল হারিয়ে গৃহস্থ অস্থির হয়ে উঠলেন। বনে-বাদাড়ে, বাঁশ ঝোপে, কলুপাড়ায়, মোল্লাপাড়ায়, বাজারে নদীর ঘাটে সর্বত্র খুঁজলেন ছাগলটাকে। কিন্তু যাঁদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই জানেন হারানো ছাগল খুঁজে পাওয়া সোজা কথা নয়।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে ছাগলটা খুঁজে অবশেষে ব্যর্থ হয়ে গৃহস্থ বাড়ি ফিরলেন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত অবস্থায়। তখন দাওয়ার ওপরে মাদুরে বসে লণ্ঠন জ্বেলে গৃহস্থের ছেলে পরের দিনের স্কুলের পড়া করছে।

বাড়ি ফিরে দাওয়ার সামনে সিঁড়ির ওপরে ধপাস করে বসে পড়লেন গৃহকর্তা, তারপর বারান্দায় পাঠরত ছেলেকে বললেন, 'এক গেলাস জল খাওয়াতে পারো ভাই।' বারান্দার পাশে রান্নাঘরে উনুন ধরিয়ে রাতের রান্না করছিলেন গৃহিণী। তিনি পতিদেবতার এই আচরণ দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ওগো তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে যে নিজের ছেলেকে ভাই বলছ ?'

এ প্রশ্নের উত্তরে সিঁড়ির ওপরে বসা অবস্থায় গৃহকর্তা হাতজোড় করে বললেন, 'মা, ছাগল হারালে মানুষের কী যে অবস্থা হয়, কী করে বুঝবে মা ? যার হারায় শুধু সেই বোঝে।'

ছাগল হারানোর পর গরু হারানোর গল্প। এ গল্পটা আরও বেশি গোলমেলে।

যথারীতি এক গৃহস্থের গরু হারিয়েছে। তিনি সারাদিন ধরে পাড়া-বেপাড়ায়, ঝোপঝাড়ে, বনে-জঙ্গলে গরু খুঁজেছেন। বুনো কাঁটায় ছড়ে গেছে তার শরীর, রোদে পুড়ে তাঁর জ্বর এসে গেছে। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

গ্রামের ডাক্তারকে খবর দেওয়া হল। ডাক্তারবাবু এসে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি গরু হারানোর সমগ্র বৃত্তান্ত সঙ্গে তাঁর নিদারুণ ক্লেশের কথা ব্যক্ত করলেন। ডাক্তারবাবু সমস্ত কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে বাড়িতে ফিরে ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন, বলে দিলেন, 'রাতে শোওয়ার আগে যেন অবশ্যই দু পুরিয়া খেয়ে নেয়।'

পরদিন সাতসকালে কাক ডাকার আগে সেই আগের রাতের অসুস্থ রোগী ডাক্তারবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে ডাক্তারবাবুকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। রোগীরা সাধারণত এত সকালে আসে না তবু ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে শোওয়ার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে দেখেন কাল রাতের সেই গরুহারা গৃহস্থ উঠোনে দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখ ভর্তি হাসি।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, 'কী ব্যাপার এত সকালে? ভাল আছেন তো?' কিন্তু তিনি কোনও প্রশ্ন করার আগেই সেই গৃহস্থ আকুল কণ্ঠে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, ধন্য আপনার চিকিৎসা! ধন্য আপনার ওষুধ! রাতে দু পুরিয়া খেয়ে তো শুলাম। আর সকালে উঠে দেখছি জ্বর ছেড়ে গেছে। গায়ে ব্যথা-বেদনা জ্বালা-যন্ত্রণা কমে গেছে। আর গরুটা একা একাই গোয়ালঘরে ফিরে এসেছে। ডাক্তারবাবু আপনি সত্যিই ধন্বন্তরি, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, ধন্য আপনার ওষুধের গুণ।'

গরু-ছাগল হারানোর গল্পের পরে কেউ যেন হারানো ব্যাপারটা খোলাভাবে দেখবেন না। শুধু তো গরু ছাগল নয়, ছড়ি ছাতা নয়, মানুষ স্বপ্ন হারিয়ে ফেলে, স্মৃতি হারিয়ে ফেলে, এমনকি অন্য মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

এ সব জটিল দার্শনিক প্রসঙ্গে না গিয়ে এবং দুয়েকটি কাজকথা বলি। বেরিলি না কোথাকার বাজারে সেই যে দেহাতি-দুহিতা কানের ঝুমকো নাকি পায়ের নূপুর হারিয়ে ফেলেছিল, তার সেই হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ-গাঁথা উত্তর ভারতের গ্রামে-গঞ্জে বহুকাল গীত হয়ে আসছে। সে গান এখনও শোনা যায়।

অন্য কালের অন্য এক বঙ্গবালা তাঁর নাকছাবিটি হলুদ বনে হারিয়ে ফেলেছিল, তার সেই দুঃখের ছড়া আজও স্মরণীয় :—

'সুখ নেইকো মনে
নাক ছাবিটি হারিয়ে গেছে
হলুদ বনে বনে।'

বিবিধার্থ সংগ্রহ

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রথম বাংলা সচিত্র মাসিক পত্রিকা। প্রায় দেড়শো বছর আগে, আঠার'শো একান্ন সালে কাগজটি প্রকাশিত হয়। মাইকেল মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যে বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষরের সূচনা এবং এই সূচনা হয়েছিল 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'। পরবর্তীকালে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সম্পাদনা করেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। বিবিধার্থ সংগ্রহে অনেক রকম রঙ্গকৌতুক ছাপা হত। সেই থেকে সঙ্কলন করে ইন্দ্রমিত্র তাঁর 'রহস্যালাপ' গ্রন্থে এ কালের পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। আমি আবার তার থেকে আমার নিজের রুচিমত শেষমেষের ভাষায় কয়েকটি নিবেদন করছি। অবশ্য বাছাই করা কঠিন, অধিকাংশই এমন চমৎকার যে বাদ দেওয়া কঠিন। একটা ঘরের মধ্যে একটা ছবি রয়েছে। ছবিটা হল বাঘে-মানুষে লড়াইয়ের। সেই লড়াইয়ের ছবিতে মানুষ বাঘকে গলা টিপে মারছে। ঘরে একটা বাঘ ঢুকেছিল ছবি দেখতে, সেই বাঘকে একজন মানুষ বলল, 'দেখেছ মানুষ কেমন পরাক্রমী,' বাঘ তখন বলল, 'এই ছবি তো মানুষের আঁকা। কোনও বাঘ যদি এই ছবি আঁকত তা হলে এর বিপরীত হত।'

বিবিধার্থ সংগ্রহের অধিকাংশ রঙ্গকৌতুকই নীতিকথামূলক। সেকেন্দার শাহের একটি কাহিনী আছে, কাহিনীটি বহু পরিচিত। তবু আবারও লেখা যায়।

সেকেন্দার শাহ একবার এক পাগলকে বলেছিলেন, 'ওরে পাগল, তুই আমার কাছে কী চাস, বল ?' পাগল এ কথা শুনে বলল, 'মাছির অত্যাচার আমার সহ্য হয় না। যদি তুমি মাছিদের বারণ কর, তা হলে আমার খুব উপকার হয়।' সেকেন্দার শাহ পাগলের অনুরোধ শুনে

বললেন, 'মাছি আমার কথা শুনবে কেন ? তুমি বরং যা করা যাবে এমন কিছু চাও।' তখন পাগল জবাব দিল, 'সেকেন্দার শাহ, তুমি যদি সামান্য মাছিকে থামাতে না পারো তা হলে তোমার কাছে আর কী চাইতে পারি।'

অন্য একটি গল্পে দার্শনিকতার ছোঁয়া রয়েছে। এক চোর এক ফকিরের মাথার পাগড়ি চুরি করেছিল। ফকির তখন গোরস্থানে গিয়ে সেখানে আস্তানা পাতল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, 'ফকিরসাহেব, চোর ওই দিকে গেছে, আর আপনি এই কবরখানায় এসে বসে আছেন।' ফকিরসাহেব তখন বললেন, 'এখন চোর পালিয়েছে বটে, কিন্তু একদিন না একদিন আর সকলের মতো এই কবরখানায় আসতেই হবে। পালাবে কোথায় ?'

পালানোর অন্য একটা প্রসঙ্গ আছে বিবিধার্থ সংগ্রহে। এক শেয়ালছানার গল্প। শেয়ালছানা মাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'মা, বাইরে বেরলে যখন আমাকে কুকুরে তাড়া করবে তখন আমি কী করে পালিয়ে বাঁচব সেটা আমাকে বলে দাও।' বুদ্ধিমতী শৃগালজননী সন্তানকে বলল, 'পালিয়ে বাঁচবার অনেক উপায় আমি তোমাকে বলতে পারি কিন্তু তোমার এই বয়েসে নিজের গর্তে থাকাই বাঁচবার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়।'

শেয়ালের কাহিনীর পরে পাঁঠার কাহিনীতে যাই। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, সেকালে জীবজন্তুর গল্পের মাধ্যমে অনেক কথাই বলা হত। সেই ঈশপের যুগে, বানভট্টের কালে, তারও আগে বেদ-বাইবেল, মহাভারতের পাতায় জীবজগতের অনায়াস প্রবেশ ঘটেছিল।

আলোচ্য গল্পটিতে অবশ্য পাঁঠার ভূমিকা মুখ্য নয় তবু গল্পটি উচ্চাঙ্গের। একদা এক লোভী মানুষ তার প্রতিবেশীর পাঁঠা চুরি করে কেটে খায়। এক ভদ্রলোক এ কথা শুনে সেই লোভী ব্যক্তিটিকে বললেন, 'ভায়া, পরের জিনিস চুরি করে খাওয়া বিরাট পাপ। পরকালে তুমি এর জন্যে দুঃখভোগ করবে।' পাঁঠাচোর বলল, 'পরকালে যখন আমার বিচার হবে আমি অস্বীকার করব যে আমি ওই পাঁঠা কেটে খেয়েছি।' তখন সেই ভদ্রলোক বললেন, 'পরলোকের বিচারসভায় ওই পাঁঠা এসে সাক্ষী দেবে যে তুমি তাকে চুরি করে কেটে খেয়েছিলে।'

এর জবাবে সেই পাঁঠাচোর বলল, 'পাঁঠা আদালতে উপস্থিত হলে তো খুবই চমৎকার, আমি সেটাকে কান ধরে তার মালিকের কাছে

ফিরিয়ে দেব, তখন আর চুরির দায় থাকবে না।'

আমাদের অল্প বয়েসে স্কুল পাঠ্য ইংরেজি ট্রানস্লেশন বইয়ের শেষে অজস্র বাংলা অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকত ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য। ইন্দ্রমিত্রের বইয়ে বিবিধার্থ সংগ্রহের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দেখে মনে পড়ছে এর মধ্যে কিছু কিছু ওই সব ট্রানস্লেশন বইয়ের শেষ ভাগে ছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে নীচের এই অনুচ্ছেদটি আজ থেকে সাড়ে চার দশক আগে স্কুল-জীবনে আমাকে ক্লাসে অনুবাদ করতে হয়েছিল,

'একজন অন্ধ রাত্রিকালে একটা প্রদীপ হস্তে ও একটা কলসী মস্তকে লইয়া বাজারে যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে দেখিয়া কহিল, 'তুই তো বড় নির্বোধ, তোর পক্ষে দিবারাত্রি তুল্য, তুই কি জন্যে হস্তে প্রদীপ লইয়া যাইতেছিস।' সে কহিল, 'সত্য বটে, কিন্তু এ দীপ আমার জন্যে নহে, কেবল তোমাদের নিমিত্ত লইয়া যাইতেছি। ইহা না হইলে অন্ধকারে তোমরা আমার এ কলসী ভাঙিয়া ফেলিতে পার।"

অতঃপর বিবিধার্থ সংগ্রহের রঙ্গকৌতুক থেকে আর একটি অবিনাশী গল্প। অতিক্ষুদ্র কিন্তু অসামান্য।

এক ব্যক্তির ছেলে কুয়োয় পড়ে গেছে। তার বাবা ছেলেকে বলল, 'আমি তোমাকে তোলার জন্যে দড়ি আর ঝুড়ি আনতে যাচ্ছি। তুমি এখানেই থেকো, তুমি যেন আর কোথাও যেয়ো না।'

বিশ্বকাপ বনাম নিঃস্বকাপ

বিশ্বকাপ বিষয়ে কখনও কিছু লিখিনি, এমন কথা লিখতে গিয়ে খেয়াল হল, কথাটা পুরোপুরি সত্যভাষণ হবে না। মনে পড়ল, দুই কিস্তি আগের বিশ্বকাপে, মানে সেই উনিশশো ছিয়াশিতে দৈনিক পত্রিকার ছোটদের পাতায় 'বিশ্বকাপ দিচ্ছে চাপ' এই রকম অকিঞ্চিৎকর একটি ছড়া লিখেছিলাম, কিংবা বলা উচিত, এ-সব ক্ষেত্রে যেমন হয়, লিখতে হয়েছিল। আরও মনে পড়ছে, সেই হাস্যকর ছড়াটিতে 'রক্তচাপ', 'বাপরে বাপ' এই রকম কষ্টপ্রসূত কয়েকটি মিলও ছিল।

বিশ্বকাপ তথা ফুটবল খেলা সম্পর্কে আমার যে লিখতে আপত্তি আছে তা কিন্তু নয়, তবে একটা বড়সড় মানসিক বাধা আছে। আমার পক্ষে খুবই অসম্মানজনক ঘটনা সেটা।

বলা বাহুল্য, আমার আরও বহুবিধ বিড়ম্বনার কাহিনীর মতোই আমি সেই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলাম অনেকদিন আগে 'খেলাধূলা' নামক রম্যরচনায়। আজ আবার বিশ্বকাপ বা ফুটবল খেলা সম্পর্কে লিখতে বসে সেই কাহিনীর পুনরুল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না।

সে অনেকদিন আগের কথা। আমি তখন সদ্য কিশোর। স্থান পূর্ববঙ্গের এক মফস্বল শহর, যে শহরের কথা আমি নানা জায়গায় নানা ছলে বলেছি এবং লিখেছি। অবশ্য আমার এবারের স্মৃতিচিত্রটি মোটেই মধুর নয়।

আমার তখন বয়েস এগারো-বারো, ইস্কুলের মাঝামাঝি ক্লাসে, এই সিক্স-সেভেনে পড়ি। পড়ার চেয়ে খেলি বেশি, খেলাটা ফুটবল। একবার আমি সারাদিন খেলেছিলাম, কিংবা আরও বেশি।

সূর্যাস্তের পরেও প্রায় আধঘণ্টা, সকাল থেকে শুরু করে। শুধু দুপুরে দশমিনিটের জন্য বাড়ি ছুটেছিলাম ভাত খেয়ে আসার জন্যে। স্নান করতে হয়নি, কারণ সারাদিনে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, তাতেই হয়ে গিয়েছিল।

সেই আমার শেষ ফুটবল খেলা। আমি অসুস্থ হয়ে বা কোনওরকম আঘাত পেয়ে খেলা ছেড়ে দিয়েছিলাম তা নয়। ও বয়েসে ওরকম কদাচিৎ হয়।

আসলে সেদিন আমাদের ছিল দুই পাড়ার মধ্যে অবিরাম ফুটবল প্রতিযোগিতা। বোধহয় রবিবার ছিল সেটা, খেলোয়াড়দের সকলেরই ছুটির দিন। সেই সুযোগে অবিরাম ম্যাচ।

এ রকম একটি উদয়াস্ত দম বার করা খেলার পিছনে একটি ইতিহাস আছে। ইতিহাসটি স্মরণীয়। অল্প কিছুদিন আগে গরমের ছুটির সময় আমাদের শহরে এক বিখ্যাত কীর্তনিয়া এসেছিলেন, এত দিন পরে সে ভদ্রলোকের নাম মনে পড়ছে না, কিন্তু মনে আছে তিনি টানা তিনদিন প্রায় অবিরাম হরিনাম গান করেছিলেন এবং সেই সংকীর্তনে আবালবৃদ্ধবনিতা অংশগ্রহণ করেছিল। তার পর থেকে অবিরাম কথাটা আমাদের মাথার মধ্যে ঘুরছিল, যার পরিণতি ওই অবিরাম ফুটবল ম্যাচ।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে সময় নষ্ট করা মোটেই উচিত হবে না। সেই

অবিরাম ম্যাচটার কথা বলি।

আমাদের পাড়ায় ফুটবল খেলার উপযুক্ত মাঠ ছিল না। ফলে বিপক্ষ পাড়ার মাঠে খেলতে হয়েছিল।

আমি ছিলাম কনিষ্ঠতম এবং সেই জন্যে খেলতাম গোলে। এটাই নিয়ম, সবচেয়ে যে ছোট সে গোলে খেলবে। দুপুর পর্যন্ত ভালই খেলেছিলাম আমরা, সাত গোল দিয়েছিলাম, বিপক্ষ ছয় গোল শোধ দিয়েছিল, আমরা এক গোলে এগিয়ে ছিলাম। বিকেলের দিকে বিপর্যয় শুরু হল, ওদের বড় পাড়া, ওরা ছয়জন প্লেয়ার পালটাল। আমাদের এগারো জনই জোগাড় হয় না, পালটাব কী করে ?

একের পর এক গোল হতে লাগল। আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। ফলে আরও গোল খেতে লাগলাম। ইতিমধ্যে দিন শেষ, সন্ধ্যার আবছায়ায় খেলা চলছে, সেই সুযোগে আমাদের দলের খেলোয়াড়রা একে একে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা ধরে দৌড়ে পালাতে লাগাল।

অবশেষে পুরো দলে আমি একা, কী করব। গোলকিপারের পক্ষে গোল ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া কঠিন।

সুতরাং আমি ধরা পড়লাম। ধরা পড়ার পর জানতে পারলাম, আমরা মাত্র এগারো গোল দিয়েছি, বিপক্ষ দল দিয়েছে বত্রিশ গোল।

তারা সবাই মিলে আমাকে ঘিরে ধরল, হেরে যাওয়া বাকি একুশ গোল আমাকে শোধ দিয়ে যেতে হবে, না হলে খেলা চলবে, সারারাত অবিরাম ফুটবল ম্যাচ চলবে।

খেলা চললে তো আরও মারাত্মক কথা, আরও গোল খাব, সে গোল জন্মেও শোধ দিতে পারব না। সুতরাং আমি এ প্রস্তাবে করুণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালাম।

বিপক্ষের ছেলেরা আমার প্রতিবাদ আধাআধি মেনে নিয়ে বলল, 'তা হলে তুমি একুশটা গোল শোধ দিয়ে দাও।' আমি বললাম, 'এগারো জনে গোল খেলাম, আমি একা শোধ দেব কেন ? আমাকে ছেড়ে দাও।'

আমার এই যুক্তিযুক্ত জিজ্ঞাসায় ও পক্ষের সবাই মিলে অনেক আলোচনা করে অবশেষে আমাকে বলল, ঠিক আছে, তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু তার আগে তুমি একুশটা শোধ-না-হওয়া গোলের জন্য একুশ ইঞ্চি নাকে খত দেবে, দিয়ে বলবে, 'জীবনে আর ফুটবল খেলব না।'

চৌকস পাঠক, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, সেদিন আমি

একুশ ইঞ্চি নাকে খত দিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, জীবনে আর তার পরে হাত দিয়ে কিংবা পা দিয়ে কোনও দিনই ফুটবল স্পর্শ করিনি।

এবং ফুটবল নিয়ে কিছু লেখারও ভরসা রাখি না। তবুও এই রচনা শেষ করার আগে দুয়েকটি ফুটবলীয় রঙ্গের কথা বলি।

একটি তো খুবই পুরনো। ফুটবলের আদি যুগের কথা। তখন সদ্য ফুটবল এদেশে চালু হয়েছে। মাঠে অনেকগুলি ছেলে মিলে ফুটবল খেলছিল। স্থানীয় জায়গিরদার খেলা দেখে নাকি বলেছিলেন, 'আহা, এতগুলি ছেলে একটা বল নিয়ে খেলছে। অনেকে তো বলে লাথি মারার সুযোগই পাচ্ছে না। নায়েবমশায়, আপনি ওদের প্রত্যেককে একটা করে বল কিনে দিন।'

পরেরটি আধুনিক কাহিনী। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী টিমের কোচের মধ্যে কথোপকথন :—

প্রথম কোচ : তা হলে হাফ টাইমের পরে তোমার দল প্রথমে দুটো গোল খাবে। তারপরে একটা শোধ দেবে।

দ্বিতীয় কোচ : না। সেটা ঠিক হবে না। দর্শকদের এতটা প্রতারণা করা ঠিক হবে না। সারাদিন লাইন দিয়ে, কষ্ট করে টিকিট কেটে পাবলিক আসবে। তাদের ঠকানো উচিত হবে না।

প্রথম কোচ : তবে ?

দ্বিতীয় কোচ : খেলাটা ড্র যাবে। তার পর অতিরিক্ত সময়েও ড্র থাকবে। টাইব্রেকারে আমরা দু গোল খাব। তোমরা এক গোল খাবে। তা হলেই ঠিক হবে।

পুনশ্চ:

ফুটবলের খবরে খবরের কাগজগুলি ছয়লাপ। এরই ফাঁকে একটি ছোট খবর বেরিয়েছে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের তুচ্ছ একটি রিপোর্ট। ভারতীয়দের মাথাপিছু বার্ষিক আয় বাংলাদেশিদের থেকেও এখন কমে গেছে।

বিশ্বকাপ আমাদের জন্য নয়, তবে নিঃস্বকাপ প্রতিযোগিতায় আমরা নিঃশব্দে প্রথম হতে চলেছি।

কান্তকবি

'স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে।
মিটিল সব ক্ষুধা সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগিরে।'...

সেই রজনীকান্ত সেন। যিনি সেই বঙ্গভঙ্গের বছরে, উনিশ শো পাঁচ সালে, গান বেঁধেছিলেন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' রাজশাহির পল্লীকবি বাংলার জাতীয় কবি হয়েছিলেন।

রজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ছিলেন। পাবনা জেলায় বাড়ি, ওকালতি করতেন রাজশাহিতে। মেধাবী ছাত্র ছিলেন, সাঁতারে ব্যায়ামে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অসামান্য সঙ্গীতস্রষ্টা, সুরকার, গায়ক রজনীকান্ত এখনও রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ-নজরুলের সঙ্গে স্মরণীয়।

কিন্তু এই 'শেষমেশ' রচনামালায় আমরা তাঁকে এতকাল পরে স্মরণ করছি তাঁর কৌতুকবোধের জন্যে। মধ্যযৌবনে, তাঁর প্রতিভাসূর্য যখন মধ্যগগনে তখনই তিনি দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে দেহত্যাগ করেন। তবু তাঁর গানের মতোই কৌতুককুসুমগুলি বাঙালির মানস-সলিলে এখনও ভাসমান।

সে আমলে অনেকেই নানা কারণে, বিশেষত পুত্রার্থে একাধিকবার বিবাহ করতেন। আইনের বাধা ছিল না, সামাজিক বিধিনিষেধও ছিল না। শিক্ষিত ভদ্রলোকের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ সমাজের চোখে গর্হিত অপরাধ ছিল না।

এক বন্ধুর দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে রজনীকান্ত বরযাত্রী গিয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে কিন্তু প্রথমা স্ত্রী বর্তমান অবস্থাতেই। বিয়ের পর বর-বউ নিয়ে ফেরার পথে নতুন বউ-এর জ্বর এল।

সে ছিল গভীর জ্বরের যুগ। কালাজ্বর, পালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, সান্নিপাতিক, পিলেজ্বর, তিলেজ্বর। বাঙালি সারা বছর ধরে জ্বরে ভুগত।

রজনীকান্তের বন্ধু নববধূর সঙ্গে সামনের নৌকায় ছিলেন। সেকালে বঙ্গজীবনের অঙ্গ ছিল থার্মোমিটার। নববধূর দেহতাপ থার্মোমিটারে মেপে উদ্বিগ্ন চিত্তে সামনের নৌকো থেকে বর পিছনের

নৌকোয় বরযাত্রী রজনীকান্তকে বললেন, 'নতুন বউ-এর খুব জ্বর।'

রজনীকান্ত জানতে চাইলেন, 'কত জ্বর?'

বন্ধুবর বললেন, 'থার্মোমিটারে দেখছি একশো তিন।'

রজনীকান্ত বললেন, 'আগেও এক সতীন। এখনও একশো তিন।'

রজনীকান্ত ওকালতি করতেন রাজশাহি আদালতে।

কিন্তু নিজের সম্পর্কে কিংবা নিজের জীবিকা বিষয়ে তাঁর কোনও মোহবোধ ছিল না।

এই প্রসঙ্গে রাজশাহি আদালতের বার লাইব্রেরিতে কথিত রজনীকান্তের অনেক গল্পই আজও স্মরণীয়। সংক্ষেপে দুয়েকটি গল্প বলি।

এক গ্রাম্য ব্যক্তি দুটো গরু নিয়ে যাচ্ছে। একটি গরু হৃষ্টপুষ্ট অন্যটি ক্ষীণ। সেই একই রাস্তা দিয়ে জনৈক ব্যবহারজীবী যাচ্ছিলেন। তিনি চাষীকে বললেন, 'ওহে তোমার একটা গরু এত মোটা আর অন্যটা দেখছি খুবই রোগা। তুমি ভাল করে ওটাকে খেতে দাও না কেন?' সেই শুনে চাষী বলল, 'না উকিলবাবু, তা নয়। আসলে আমার ওই যে মোটা ষাঁড়টা দেখছেন ওটা হল উকিল। আর, ওই রোগা ষাঁড়টা হল মক্কেল। বুঝলেন তো উকিলবাবু।'

উকিল-মক্কেল বিষয়ে রজনীকান্তের আর একটি অসামান্য কাহিনী ; এই গল্পটি কথোপকথনের আকারে না লিখলে হবে না :—

উকিলবাবু : বিয়ের সময় তোমার বয়েস কত ছিল?

মক্কেল : আজ্ঞে, সতেরো বছর।

উকিলবাবু : তখন তোমার স্ত্রীর বয়েস কত ছিল?

মক্কেল : আজ্ঞে, তেরো বছর।

উকিলবাবু : এখন তোমার বয়স কত?

মক্কেল : আজ্ঞে, তিরিশ বছর।

উকিলবাবু : এখন তোমার স্ত্রীর বয়েস কত?

মক্কেল : আজ্ঞে, সে প্রায় ছেচল্লিশ, সাতচল্লিশ অন্তত হবে।

উকিলবাবু : সে কী হে? তোমার বউ-এর বয়েস হঠাৎ বেশি হয়ে গেল কেমন করে?

মক্কেল : হুজুর, ওই কথাটাই যে কোনও ভদ্রলোককে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। মেয়েমানুষের বাড় যে বড় বেশি।

সত্যিই এই কথোপকথনের কোনও তুলনা নেই। যে কোনও

নাটকের যে কোনও দৃশ্যে এই কথোপকথনটা থাকলে শুধু এই বাক্যালাপের জোরেই সেই নাটকটি উতরিয়ে যাবে। উকিল রজনীকান্তের পরে অবশেষে কবি রজনীকান্তের কাছে যাই।

কবি রজনীকান্তের একটি কাহিনী বলি। সেটিও চমৎকার।

সে বছর রজনীকান্তের 'অমৃত' নামে কবিতার বই, নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

এর মধ্যে এক দিন সেকালের কবি রসময় লাহা কান্তকবির সমীপে এলেন, সেকালের পক্ষে রসময়বাবু খুবই আধুনিক, তাঁর সদ্যপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'ছাইভস্ম', তিনি সেই কবিতার বইটি রজনীকান্তকে উপহার দিলেন।

অতঃপর কান্তকবি তাঁর 'অমৃত' কাব্যগ্রন্থটি লাহাবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'ছাইভস্ম দিয়ে অমৃত নিয়ে যান।'

জ্যোতিষী

একযুগ আগে, সেই কাণ্ডজ্ঞানের আমলে কিছু না বুঝে সরলভাবে জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ বিষয়ে হালকা কথা লিখে ঘোরতর বিপদে পড়েছিলাম।

সেই রাজার কথা কি মনে আছে, যাঁর গল্প কোথা থেকে টুকে যেন লিখেছিলাম। গল্পটা তেমন বড় নয়, যাঁরা আগে পড়েননি, যাঁরা বোধ হয় পড়েছিলেন কিন্তু এখন ভুলে গেছেন, তাঁদের সকলের জন্যে গল্পটা আরেকবার বলা চলে।

এক যে ছিল রাজা। রাজা চমৎকার রাজত্ব করছিলেন মনের সুখে, আনন্দ মনে। সকালে রাজসভা, পাত্র-মিত্র, অমাত্য, নর্তকী। দুপুরে ভুরিভোজন ও দিবানিদ্রা। সন্ধ্যায় বয়স্য ও মোসাহেবদের সঙ্গে প্রাণ ভরে সুরাপান এবং সেই সঙ্গে নাচগান।

এর মধ্যে একদিন সকালবেলায় রাজসভায় এক জ্যোতিষী এসে উপস্থিত। গণকঠাকুরের কাঁধে নামাবলী, কপালে চন্দনের তিলক, মাথায় জবাফুল বাঁধা টিকি, হাতে লাল খেরোয় বাঁধানো গণনার খাতা, পায়ে কাঠের খড়ম। রাজসভার সকলেই তাঁকে দেখে রীতিমত অভিভূত হয়ে গেল। জ্যোতিষঠাকুরকে সবাই খুব সমীহ-সম্ভ্রম

করতে লাগল।

মুখে মুখে রটে গেল যে ইনি ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতিষী। মানুষের হাত দেখে তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ঝরঝর করে বলে দিতে পারেন। অতীত বা বর্তমানের কথা না হয় বলেই দেওয়া গেল, গণকঠাকুরের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়।

বলা বাহুল্য, রাজামশায়ের হাতও জ্যোতিষঠাকুর দেখলেন। লাল খেরোর খাপ খুলে অনেক আঁকিবুঁকি, কাটাকুটি করলেন। ক্রমশ জ্যোতিষঠাকুরের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, তাঁকে খুবই চিন্তান্বিত দেখাল।

উৎকণ্ঠিত রাজামশায় জানতে চাইলেন, 'কী হল, গণকঠাকুর মশায়? কোনও খারাপ কিছু দেখলেন নাকি? কোনও দুর্ভাবনার কারণ আছে?'

'আর খারাপ! আর দুর্ভাবনা!' সজোরে নিজের কপাল চাপড়ালেন গণকঠাকুর, তারপর একেবারে ডুকরে উঠলেন, 'সর্বনাশ শিয়রে এসে পড়েছে। যাকে বলে সেই শিরে সংক্রান্তি।'

এর পরে শুধু রাজামশায় কেন, মন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্য, সভাসদ সবাই হাহাকার করে উঠলেন, সকলের মুখেই শুধু এক প্রশ্ন, 'হাতে কী দেখলেন, কী এত মারাত্মক ব্যাপার হয়েছে।'

সবাইকে থামিয়ে দিয়ে গণকঠাকুর বললেন, 'রাজামশায়ের ভয়ঙ্কর শনির দশা চলছে। একটা কিছু প্রতিবিধান না করলে, অবিলম্বে কোনও ব্যবস্থা না নিলে, কয়েক দিনের মধ্যে রাজামশায়ের মৃত্যু অনিবার্য।'

এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রাজসভার সকলের মুখ সাদা হয়ে গেল। রাজামশায় নিজে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। শুধু তরুণ সেনাপতির মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগল, এই একটু আগেই রাজামশায় চমৎকার সুস্থ, সতেজ, হাসিখুশি ছিলেন আর এই গণক খেরোর খাতা খুলে কী না কী হিসেব করল, রাজামশায় তাতেই এত ঘাবড়িয়ে গেলেন!

তরুণ সেনাপতি গণকঠাকুরের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা গণকঠাকুর, আপনি কি নিশ্চিত যে আপনার বিচার সঠিক, আপনার গণনা নির্ভুল?'

এই প্রশ্ন শুনে গণকঠাকুর হেসে ফেললেন। তার পর বললেন, 'সেনাপতিমশায়, আপনার বয়েস কম, আপনি অনভিজ্ঞ, তাই জানেন না জ্যোতিষ গণনা কখনওই ভুল হয় না। আমি যা বলছি, তা

অভ্রান্ত।'

সেনাপতি তখন জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনি কি নিজের ভাগ্য কখনও গণনা করেছেন ?' জ্যোতিষী প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'অবশ্যই।'

সেনাপতি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি হিসেব করে দেখেছেন আপনার পরমায়ু আর কত দিন ?'

জ্যোতিষী বললেন, 'সে আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর। আপনার চেয়ে বেশি বাঁচব।'

জ্যোতিষীর কথা শোনামাত্র সেনাপতি তাঁর কোমরের খাপ থেকে তীক্ষ্ণ তরবারি বের করে এক কোপে জ্যোতিষীর গলা কেটে ফেললেন। রাজসভার গালিচায় ধড় থেকে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেল। বীভৎস রক্তারক্তি কাণ্ড, স্তম্ভিত রাজা বললেন, 'সর্বনাশ ! এটা কী হল। আমার ব্রহ্মহত্যা হল।'

সেনাপতি বললেন, 'হুজুর, আমাকে ক্ষমা করবেন। জ্যোতিষঠাকুর বলেছিলেন, আপনার আয়ু আর নেই। আর তাঁর নিজের পরমায়ু আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর। দেখলেন তো তাঁর আয়ু এক মুহূর্তও ছিল না। যিনি নিজের আয়ু জানেন না, তিনি অন্যের ভাগ্য, অন্যের আয়ু কী করে বিচার করেন ?'

জ্যোতিষীর দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ সভাসদেরা ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেলেন। রক্তমাখা গালিচাটা ফেলে দিতে হল।

রাজামশায়ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হলেন।

আবার জ্যোতিষী

শাস্ত্রে মূকের কথা বলার এবং পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের কথা আছে। কিন্তু সেখানে অন্ধ বা দৃষ্টিহীনের দেখার কথা কিছু নেই।

সম্প্রতি একটি পত্রিকায় রবিবাসরীয় গ্রহরত্নের, জ্যোতিষের এলাকায় একটি বিজ্ঞাপন দেখে চমকিত হলাম। এক জন্মান্ধ হাত দেখছেন এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান হুবহু মিলিয়ে দিচ্ছেন।

খবরের কাগজে আরও একটা খবর পড়লাম। হাসির বিষয় নয়, ভয়াবহ খবর। কুচবিহারের মদনমোহনের বিগ্রহ চুরি করার ব্যাপারে

মূর্তিচোরদের সাহায্য করার জন্য যে কয়জন সরকারি কর্মচারী ধরা পড়েছেন এবং বরখাস্ত হয়েছেন, তাঁদের একজনের ক্ষেত্রে ঘটনাটা ঘটে গেছে জ্যোতিষের কল্যাণে।

ছাপোষা কর্মচারী নিজের ভাগ্যগণনা করতে গিয়েছিলেন। খুবই উপযুক্ত স্থানে গিয়েছিলেন, তাঁরই বিভাগীয় ওপরওয়ালা স্বয়ং হাত দেখেন, ছক বিচার করেন। অনেক দেখে-শুনে গণকঠাকুর অভিমত দিয়েছিলেন যে, কর্মচারীটির আশু ভবিষ্যৎ খুবই বিপজ্জনক এবং গ্রহশান্তি করা ছাড়া পরিত্রাণ নেই। এই গ্রহশান্তির জন্য অতি অবশ্য অবিলম্বে একটি মূল্যবান প্রস্তর ধারণ করতে হবে যার ব্যয় অন্তত পনেরো-বিশ হাজার টাকা।

মূর্তিচোরদের কাছে ঘুষ পাওয়া সোনা বেচে ওই কর্মচারীটি হাজার বারো টাকা পেয়েছিলেন, আর কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পারলেই, প্রস্তর ধারণ করলেই তাঁর ফাঁড়া কেটে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা হল না। একেই বলে বিধির বিড়ম্বনা।

গ্রেপ্তারির পরে কর্মচারীটির বোন সাশ্রু নয়নে বলেছেন, 'আমার দাদা কখনওই ঘুষ খেত না। কখনওই এ রকম ছিল না। ওই হাত দেখাতে, ভবিষ্যৎ জানতে গিয়ে এই বিপদে পড়ল।'

খুব দুঃখের ব্যাপার হলেও সুকুমার রায়ের সেই বিখ্যাত ছড়াটি এই সূত্রে মনে পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেই কতকাল আগে 'ও পাড়ার নন্দখুড়ো আমাদের নন্দ গোঁসাইয়ের কথা লিখেছিলেন সুকুমার রায়।

ভালই ছিলেন নন্দখুড়ো, হুঁকো হাতে হাস্যমুখে। অমায়িক শান্ত বুড়ো, অসুখ-বিসুখ ছিল না। হঠাৎ কী হল, হাত দেখাতে গেলেন, ফিরে এলেন ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে, কাঁদতে কাঁদতে। খুড়োকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কী হয়েছে নন্দ গোঁসাই? কাঁদছ কেন?...'

...খুড়ো বলে, বলব কি আর,
হাতে আমার স্পষ্ট লেখা
আমার ঘাড়ে আছেন শনি,
ফাঁড়ায় ভরা আয়ুর রেখা।
এতদিন যায়নি জানা
ফিরছি কত গ্রহের ফেরে
হঠাৎ আমার প্রাণটা গেলে
তখন আমায় রাখবে কে রে?

সংবাদপত্র দিয়েই যখন শুরু করেছি, আরেকবার সেখানে ফিরে যাই। কয়েক সপ্তাহ আগে সংবাদপত্রে পড়লাম কলকাতায় 'জ্যোতিষ সম্মেলন' হচ্ছে। সেখানে যুক্তিবাদীরা কয়েকটি প্রশ্ন তুলতে গিয়ে সম্মেলনের সংগঠকদের হাতে প্রহৃত হলেন। অনেকগুলো পত্রিকায় সম্মেলনের বিবরণ এবং গোলমালের বর্ণনা শুনে মনে হল সংগঠকেরা আগে থেকেই আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

পরে জানা গেছে যে, ওই সম্মেলনের উদ্যোক্তা জ্যোতিষীরা আগে থেকেই গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে জানতে পেরেছিলেন যে সম্মেলনে গোলমাল হবে এবং সেই জন্য তাঁরা যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

যাঁরা খবরের কাগজে এই সংবাদটি পাঠ করেছেন, জ্যোতিষ গণনার এ জাতীয় উৎকর্ষে নিশ্চয়ই তাঁরা যথেষ্টই চমকিত হয়েছেন। তবে এই পৃথিবীতে মন্দ লোকের অভাব নেই। তাঁরা সব কিছুই সন্দেহের চোখে দেখেন, সব কিছুতেই কটাক্ষ করেন।

সংবাদপত্রে এই খবর পাঠ করে জনৈক পাঠক একটি প্রশ্ন তুলেছেন। জ্যোতিষঠাকুরেরা শুধু শুধু যুক্তিবাদীদের মারধর করতে গেলেন। তাঁরা তো অনায়াসেই শনি কিংবা রাহু লেলিয়ে দিতে পারতেন যুক্তিবাদীদের ওপর। শনির কোপে, রাহুর দোষে যুক্তিবাদীরা ছারখার হয়ে যেতেন। অন্যথায় সরাসরি করতে পারতেন শত্রুনিধন যজ্ঞ, এ দাওয়াই অব্যর্থ, 'মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে শত্রু পরাস্ত হইয়া থাকে।' পঞ্জিকায় দেখেছি, খরচও খুব বেশি নয়, 'মাত্র নয়শত নিরানব্বই টাকা।' তবে বিশেষ জরুরি হলে কিংবা শত্রু মহাপরাক্রমী হলে এই সঙ্গে 'বগলামুখী কবচ' ধারণ করলে ফল আরও জোরদার হত। বগলামুখী কবচের খরচও খুব বেশি নয়, মাত্র এক হাজার একশো এগারো টাকা।

পুনশ্চ :

আপনি জ্যোতিষ শিখতে চান ?

জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রথম পাঠ আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি নিতান্ত বিনামূল্যে। অবশ্য শিক্ষান্তে সন্তুষ্ট হলে আপনি আমাকে যে কোনও উপঢৌকন পাঠালে আমি আপত্তি করব না। তবে দয়া করে মন্ত্রপূত আংটি, কবচ বা মাদুলি পাঠাবেন না যেন, এ-সবে আমার বড় ভয়।

এবার জ্যোতিষের প্রথম পাঠ। যে কোনও ব্যক্তির হাত দেখুন।

দেখে তাঁকে বলুন, 'আপনার শত্রুদের মধ্যে একজন আছেন, যাঁর নামের আদ্যক্ষর ইংরেজি (S), দেখবেন তিনি কেমন অভিভূত হন। কারণ বাঙালির শত্রুর অভাব নেই এবং অসংখ্য লোকের নামের আদ্যক্ষর

এস। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হওয়ার কোনও কারণ নেই। মিলবেই, মিলবে।

পথের ভিখিরি

কথায় বলে 'লোকটা একেবারে পথের ভিখিরি হয়ে গেছে।' সাধারণত এরকম কথা বলা হয় যার সম্বন্ধে সে রেস বা জুয়া খেলে, কিংবা শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজি করে অথবা নিতান্ত ভাগ্যবিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। তবে ভাষাটা ঠিক সমবেদনার নয়। পথের ভিখিরি ভিখিরিদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু জাতের।

পথের ভিখিরি নিয়ে গল্পের আদিঅন্ত নেই। এর মধ্যে অনেক কাহিনীই বহুশ্রুত। সুতরাং একটি অতি সম্প্রতি শোনা গল্প দিয়েই আরম্ভ করা উচিত হবে।

রাস্তার মোড়ে যথারীতি জনৈক ভিক্ষুক পথচারীদের কাছে পয়সা চাইছিল। তবে নিতান্ত পয়সা নয়, সে পুরো একটা টাকা চাইছিল পাউরুটি কিনে খাবার জন্যে। এক ভদ্রলোক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেদিন কোনও কারণে তিনি খুব দিলদরিয়া হয়ে পড়েছিলেন। ভিখিরিটির প্রসারিত করতলে তিনি পকেট থেকে প্রথমে একটা এক টাকার কয়েন, তার পরে আরেকটা এক টাকার কয়েন, মোট দু টাকা বার করে দিলেন। টাকা দুটো গ্রহণ করে ভিখিরিটি বলল, 'স্যার, আর একটা আধুলি যদি দিতেন।' ভদ্রলোক থমকিয়ে গিয়ে বললেন, 'কেন, দু টাকায় পাউরুটি হবে না? তুমি তো এতক্ষণ এক টাকা চাইছিলে পাউরুটি কেনার জন্যে।' ভিখিরিটি করুণ মুখে বলল, 'স্যার পাউরুটি নয়, আড়াই টাকা পেলে একটা কেক কিনে খেতাম।' দাতা ভদ্রলোক অবাক হলেন, 'পাউরুটি চলবে না, কেক খেতে হবে?' ভিখিরি সবিনয়ে বলল, 'আজ একটা কেক খেতে পারলে ভাল হত স্যার, আজ আমার জন্মদিন কিনা।'

এই দুঃখজনক কাহিনীর পরে যতই পুরনো হোক দু-তিনটে হাসির গল্প বলা প্রয়োজন।

সেই ভিখিরির কথা তো সকলেই জানেন যে আগে রাস্তায় একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালা নিয়ে বসত, তাকে একদিন দেখা গেল সে দু

পাশে দুটো থালা নিয়ে বসেছে। তাকে নাকি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'কী হে, এতদিন একটা থালা ছিল, এখন দুটো থালা হল কী জন্যে ?' বুদ্ধিমান ভিখিরি একগাল হেসে জবাব দিয়েছিল, 'একটা ব্রাঞ্চ অফিস খুললাম স্যার।'

কিন্তু গরিব দীনদুঃখী ভিখিরিকে এ-সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সত্যিই কি কোনও মানে হয় ?

এক কৃপণ ভদ্রলোকের কাছে এক অন্ধ ভিখিরি পঞ্চাশ পয়সা প্রার্থনা করে। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে ভিখিরিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কিন্তু তুমি কি পুরোপুরি অন্ধ ?' ভিখিরিটিকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে তোমার একটা চোখ খারাপ বটে কিন্তু আরেকটা চোখে বেশ দেখতে পাও।' ভিখিরি বলল, 'ঠিক আছে, আপনার কথাই ঠিক বড়বাবু, আপনি আমাকে তা হলে দুটো চোখের জন্য পঞ্চাশ পয়সা না দিয়ে একটা চোখের জন্য পঁচিশ পয়সাই দিন।'

অন্ধ ভিখিরির সমস্যার শেষ নেই। এক খঞ্জ ভিখিরির থালায় একটা সিকি দিয়ে দয়ালু মহিলা বলেছিলেন, 'বাবা, তবু ভাল তুমি খোঁড়া, অন্ধ নও। তুমি তো চোখে দেখতে পাচ্ছ।' ভিখিরিটি বলেছিলেন, 'সত্যি বলেছেন মা, অন্ধ হলে বড় অসুবিধে হয়। অন্ধ হয়ে দেখেছি লোকে বড় বেশি অচল পয়সা দেয়।'

এর চেয়ে মারাত্মক অন্য এক ভিখিরি ও তার ভাইয়ের গল্প। গল্পটি শুধু মিথ্যে নয়, অবিশ্বাস্য। দুই ভাই একই রাস্তার দুই দিকে দুই মোড়ে ভিক্ষা করে। এক ভাই বোবা ভিখিরি, অন্য ভাই অন্ধ ভিখিরি। এক ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ে এসে সেখানে দণ্ডায়মান অন্ধ ভিখিরির থালায় প্রতিদিন নিয়ম করে একটা দশ পয়সা দিতেন। সেদিন এসে দেখেন, মোড়ে সেই অন্ধ ভিখিরিটি নেই। তার জায়গায় অন্য একজন ভিক্ষুক থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে এই নতুন ভিক্ষুকের কাছে ওই ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, 'এখানে যে অন্ধ ভিখিরিটি নিয়মিত দাঁড়ায় সে গেল কোথায় ?' নতুন ভিখিরিটি অম্লানবদনে জবাব দিল, 'বাবু ওই অন্ধ ভিখিরিটি আমার ভাই। ও আজকে একটু সিনেমা দেখতে গেছে, ওই সামনের হলটায়। তাই আমি ওর জায়গায় ভিক্ষে করছি।'

দয়ালু ভদ্রলোক অন্ধ ভিখিরি সিনেমা দেখতে গেছে জেনে হতভম্ব হয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর বিস্মিত হওয়ার তখনও বাকি ছিল, কারণ

নতুন ভিখিরিটি এর পরে আরেকটি প্রসঙ্গ যোগ করল, সে মধুর হেসে বলল, 'আমি হলাম গিয়ে ওর দাদা, ওই সামনের মোড়ের বোবা ভিখিরি। আজ ও না থাকায় এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।'

এর পরে পথের ভিখিরির কাহিনী আর বাড়াব না। শুধু অল্প কিছু দিন আগে আমারই বলা একটা খুচরো গল্প নিতান্ত কারণে পুনর্বার স্মরণ করছি।

পথের ভিখিরি অনেক সময় অনেক ভদ্রলোক হয়ে থাকে। কেউ পকেটমার হয়েছে বলে ব্যারাকপুর যাওয়ার ট্রেন ভাড়া প্রার্থনা করে, কেউ মুমূর্ষু রোগীর জন্যে ওষুধ কিনতে বেরিয়ে টাকা হারিয়ে প্রেসক্রিপশন হাতে ভিক্ষে করে, কেউ বা তেউনি জড়িয়ে গুরুদশায় সাহায্য চায়। এই রকম এক ভদ্রলোককে রাস্তায় ভিক্ষে করতে দেখে এক পথচারী তাঁকে চিনে ফেলেন এবং প্রশ্ন করেন, 'আপনি ভিক্ষে করছেন ? আপনি সেই 'অর্থ উপার্জনের সহস্র পন্থা' গ্রন্থের লেখক নন ? ভদ্র ভিক্ষুক গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'সহস্র পন্থার মধ্যে এটাও একটা পন্থা।'

বিয়েটিয়ে

ইংরেজিতে "ELIGIBLE BACHELOR" বলে একটি বিশেষণবহ জোড়া শব্দ আছে, যার বাংলা করা কঠিন, বড় জোর টেনেটুনে বলা যায় 'যোগ্য কুমার'। কিন্তু এটাও ঠিক হল না, ব্যাচেলর আর কুমার এক নয়, কুমার হল ভারজিন আর ব্যাচেলার হল অবিবাহিত, সে ভারজিন হতেও পারে, না হওয়াও অসম্ভব নয়। আবার এলিজিবলের শব্দার্থ 'যোগ্য' খুব সঠিক নয়, 'উপযুক্ত' চললেও চলতে পারে।

সে যা হোক, কচকচি থাক। আসল কথাটা হল বিবাহযোগ্যতা নিয়ে। তা সেই যে কুড়ি বছর আগের শিশুটি যে তাদের বাসায় কোনও বিবাহযোগ্য বা অবিবাহিত যুবক এলেই অনুরোধ করত, 'বাটা বানান করো তো ?' আর কিছু না বুঝে সেই যুবকটি যেই বলত, 'বাটা বানান তো সোজা, বানান হল বি এ টি এ', সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি মুখর হয়ে উঠত, 'তাই তো বলছি, বিয়েটিয়ে করবে না ?' সেই শিশুটি

নিজেই এই দুই দশক ব্যবধানে রীতিমত বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই সঙ্গে একটি মেয়ের কথাও আসছে। সেই কবে কবি বলেছিলেন, 'জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার', সেই কুড়ি বছর আগে এই মেয়েটিও ছিল নিতান্ত নাবালিকা কিন্তু সে ছিল সাহসিকা এবং উচ্চাভিলাষিনী। তাদের বাড়িতে কোনও নববিবাহিতা রমণী এলেই সে তাঁকে তার দুধ খাওয়ার বাটি এনে দেখাত, এবং তার পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করত, 'বলো তো, এটা কী ?' সেই মহিলা যখন সরলভাবে, কোনও কিছু না ভেবে জবাব দিতেন, 'বাটি', সেই মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বাটি শব্দ মিল মিলিয়ে ছড়া কাটত, 'তোর বরের সঙ্গে সাঁতার কাটি।' মেয়েটির ইচ্ছে ও সাহস দেখে সেই নববিবাহিতা নিশ্চয় চমকিত হতেন, উক্ত শিশুকন্যাটিও ইতিমধ্যে কবে বড় হয়ে গেছে, এ গল্প বললে সে এখন আর স্বীকার করবে না যে সে এরকম করেছিল, তা ছাড়া তারও বিয়ে হয়ে গেল এই বছরের মৌসুমী-মরসুমে।

শিশুকাহিনী দিয়ে যতই না 'বিয়েটিয়ে' রচনার সূত্রপাত করি আসল সমস্যায় তো যেতেই হবে। এবং সবাই জানেন বিবাহের আসল সমস্যা হল স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা তথা দাম্পত্য কলহ।

ভোম্বললাল একজন দার্শনিক, তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী ভোম্বলবালা একজন কবি। যেমন হয়, দুজনের মধ্যে বিয়ের পর থেকে গত বারোবছর ধরে খিটিমিটি, ঝগড়াঝাঁটি সদা সর্বদা লেগেই রয়েছে। ভোম্বললাল একটি কুকুর পুষেছেন, ভোম্বলবালা একটি বেড়াল পুষেছেন। তবে আপনারা যা ভাবছেন তা হয়নি, ভোম্বললালের কুকুরের সঙ্গে ভোম্বলবালার বেড়ালের কোনওরকম মনোমালিন্য, কলহ মারামারি নেই বরং দুজনের গলায় গলায় ভাব। দরজার বাইরে একই পাপোষের ওপরে দুজনে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে।

এদিকে ভোম্বলবালাও দীর্ঘকাল ধরে ক্রমাগত পৌনঃপুনিকভাবে স্বামীর সঙ্গে কলহ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি আর ঝগড়াঝাঁটি করতে চান না, তা ছাড়া তিনি সম্প্রতি উচ্চ রক্তচাপ অসুখে ভুগছেন, ডাক্তার চিৎকার-চেঁচামেচি, উত্তেজনা নিষেধ করেছেন।

সেদিন সকালবেলাতেই এক হাত, কিংবা বলা উচিত দু হাত হয়ে গেছে। এখন চায়ের টেবিলে জানালার দিকে মুখ করে বসে ভোম্বললাল গম্ভীরভাবে ইংরেজি কাগজের পার্সোনাল কলামে সারিবদ্ধ মৃত্যুসংবাদ পড়ছেন, আর ভোম্বলবালা ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস

ফেলছেন। দরজার কাছে যথারীতি কুকুর-বিড়াল দুটো পরস্পরের কোলে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। হঠাৎ ভোম্বলবালার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গলার স্বর অস্বাভাবিক নরম করে মায়াবী গলায় তিনি ভোম্বললালকে বললেন, 'ওগো শুনছ ?' বহুকাল এমন মধুর সম্ভাষণ ভোম্বললালের কানে প্রবেশ করেনি, তিনি চমকিয়ে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ ?' ভোম্বলবালা প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের এই কুকুর-বেড়াল দুটোকে দেখছ ?' ঘটনার গতিক সুবিধের নয় ভেবে ভোম্বললাল সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।'

ভোম্বলবালা শায়িত কুকুর-বেড়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'ওগো এই দুটো সাধারণ জানোয়ার, এরা যদি ঝগড়াঝাঁটি না করে, একসঙ্গে এমন মিলেমিশে থাকতে পারে, আমরা কেন পারব না ?'

সরাসরি এই মারাত্মক প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভোম্বললাল গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ওই বেড়ালটার লেজের সঙ্গে কুকুরটার লেজ যদি একটা শক্ত গিঁট দিয়ে বেঁধে দিতে পারো তা হলেই দেখতে পাবে ওরা কেমন একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে।'

ভোম্বললাল-ভোম্বলবালার এই প্রাচীন, বহু আলোচিত গল্পের পরে দাম্পত্য কলহ নিয়ে আর কোনও কাহিনী টেনে আনা নিরর্থক। তবু একটা গল্প এই মুহূর্তে বাদ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

ঠিক গল্প নয়, সামান্য এক অতি ক্ষুদ্র কথোপকথন, ক্ষুদ্র অথচ রীতিমত মর্মান্তিক।

স্থান, নার্সিংহোমের একটি ঘর। তার মধ্যে বিছানায় হাত-পা ভাঙা, মাথা ফাটা অবস্থায় জনৈক শশাঙ্কবাবু শয্যাশায়ী, শশাঙ্কবাবুকে এক বন্ধু দেখতে এসেছেন।

বন্ধু : এ কী তোমার এ অবস্থা হল কী করে ? তোমাকে তো কাল সন্ধ্যাবেলাতেই দেখলাম এক সুন্দরী সুসজ্জিতা মহিলার সঙ্গে সিনেমা হলে ঢুকছ।

শশাঙ্কবাবু (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে) : আমার স্ত্রীও তাই দেখতে পেয়েছিলেন।

পঞ্চাশ-পঞ্চাশ

আমাদের অল্প বয়সে ছিল হাফ-হাফ, অর্ধেক-অর্ধেক। দুই বন্ধুতে মিলে কোথাও কোনও রেস্তরাঁয় খাব বা সিনেমা দেখব কিংবা বেড়াতে যাব, সিদ্ধান্ত হল হাফ-হাফ। অর্থাৎ দুজনে খরচের অর্ধেক-অর্ধেক বহন করব।

সাহেবদের দেশে কথা আছে ডাচ-লাঞ্চ। ডাচ বলতে অভিধানে জার্মান থেকে নেদারল্যান্ড পর্যন্ত হয়তো অনেককেই বোঝায় কিন্তু প্রচলিত অভিধায় আসল ডাচ হল হল্যান্ডবাসী। বোধ হয় আমাদের দেশে এদেরই ওলন্দাজ বলা হত। এ বিষয়ে, এবং অতি জটিল বিষয় এটা, আমার জ্ঞান বেশি নেই। সুতরাং ভুল হলে সম্পাদক ও পাঠকগণ ক্ষমা করবেন। আর এ রকম ভুল তো হামেশাই শেষমেশে হয়ে যাচ্ছে, সবাই মাপ করে দিচ্ছেন।

সে যা হোক, ডাচ-লাঞ্চ কথাটি খুব মজার। সত্যি সত্যি হল্যান্ডদেশিয়রা খুব কৃপণ স্বভাবের কি না সে কথা বলার মতো অভিজ্ঞতা আমার নেই। ডাচ-লাঞ্চ ব্যাপারটা হল একজন যদি আর একজনকে ডাচ-লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করে তার মানে হল দুজনে একসঙ্গে খাবে কিন্তু যে যার খাবার নিয়ে আসবে, আর হোটেল বা রেস্তরাঁয় হলে যে যার নিজের নিজের খাবারের দাম দিয়ে দেবে।

আমার স্বল্পকালের প্রবাসজীবনে অবশ্য এমন নিমন্ত্রণ খাওয়ার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু এ রকম নিমন্ত্রণ আজও চালু আছে শুনেছি। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকলেও তেমন দোষের বলে মনে হয় না। এ সেই আমাদের অল্প বয়সের হাফ-হাফ, অর্ধেক-অর্ধেকের মতোই।

দূরদর্শনে আজ অল্প কিছুদিন হল একটি নতুন বিজ্ঞাপন দেখছি ফিফটি-ফিফটি। যেহেতু এটি একটি পণ্য বিষয়ক বিজ্ঞাপন শেষমেশের কলমে এ বিষয়ে খারাপ-ভাল কিছু লেখা অনুচিত হবে। কিন্তু বিজ্ঞাপনটি চমৎকার। দূরদর্শনে বিজ্ঞাপন ছাড়া কোনও কিছুই দর্শনীয় বা শ্রবণীয় নয়। বলতে সঙ্কোচ নেই আমি দূরদর্শন বিজ্ঞাপনের ভক্ত, টিভি অ্যাডের অ্যাডিক্ট। দূরদর্শনে ফিফটি-ফিফটির বিজ্ঞাপনে একটি খুবই মজার দৃশ্য আছে। একজন খুব মোটা মানুষ অনেক জামাকাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে, গান গেয়ে বলা হচ্ছে, 'আরে, সাহেব মোটা', সাহেব একে একে সাজপোশাক ছাড়তে লাগলেন।

বেশ রোগা দেখাচ্ছে সাহেবকে, বলা হল, 'আরে সাহেব পাতলা'। কিন্তু সবশেষে প্রতীয়মান হল যে, সাহেব তেমন মোটাও নন, তেমন রোগাও নন। গায়ক আনন্দে গেয়ে উঠলেন, 'সাহেব ফিফটি-ফিফটি'। আসলে ব্যাপারটা উতরিয়ে গেছে এই ফিফটি-ফিফটি যুগ্ম শব্দের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে।

ইংরেজি ফিফটি-ফিফটি থাক। দিশি পঞ্চাশ-পঞ্চাশে আসি। পঞ্চাশ-পঞ্চাশ খুব সহজ হিসেব। দুজনের মিলিত ব্যবসা। একজনের মূলধন, একজনের পরিশ্রম। লাভের ভাগ পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। বাজারে একটা আস্ত ইলিশ বা রুই মাছ কিনে দুজনে ভাগে কিনে নিন, দেখবেন মাছওয়ালা কী আশ্চর্য দক্ষতায় মুড়ো থেকে ল্যাজা পর্যন্ত সব কিছু একেবারে ঠিক ঠিক পঞ্চাশ-পঞ্চাশ ভাগ করেছে।

আমার নিজের কিন্তু পঞ্চাশ-পঞ্চাশ সম্পর্কে একটি করুণ অভিজ্ঞতা আছে। গল্পটা পুরনো, আগে বলেছি, অনেকেই জানেন। তবু প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করতে হচ্ছে।

ঘটনাটা অনেকদিন আগেকার, একেবারে প্রাচীনকালের। সেই যখন আমার ওজন ছিল ৪৭ কেজি, থাকতাম কালীঘাটের বাড়িতে। বিয়ে হয়নি, একাই থাকি। ঠিক একা নয়, গোবিন্দ নামে এক ভৃত্য এবং আমি।

প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। আজ পর্যন্ত গোবিন্দের মতো তুখোড় লোক দেখলাম না।

রবিবারের সকালবেলা। একটু পরে দেশপ্রিয় পার্কে চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে যাব। ফেরার পথে রাসবিহারীর মোড় থেকে দু-একটা ছোটখাটো জিনিস কেনাকাটার আছে। আলমারি থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে টেবিলের ওপরে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে স্নান করতে গেছি।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখি টেবিল ফাঁকা। পেপার ওয়েটটা যথাস্থানে আছে কিন্তু সেই দশটাকার নোটটা অদৃশ্য। পেপার ওয়েটের নীচ থেকে উড়ে যাওয়া অসম্ভব তবু আশেপাশে খাটের নীচে, আলমারির পিছনে নোটটাকে খুঁজলাম। পেলাম না।

অবশেষে গোবিন্দকে ডাকলাম। বাসায় আমি আর গোবিন্দ ছাড়া কেউ নেই। আমি যখন বাথরুমে স্নান করতে গিয়েছিলাম তখন দেখেছি ও আমার ঘরের সামনের বারান্দায় মেঝে ঝাঁট দিচ্ছে।

এ টাকা গোবিন্দই নিয়েছে। গোবিন্দ ছাড়া আর কেউ নেয়নি, এ

বিষয়ে মনে মনে স্থির নিশ্চিত হয়ে শক্ত করে গোবিন্দকে ধরলাম, 'গোবিন্দ, ওই টেবিলের ওপর থেকে যে ১০ টাকার নোটটা তুমি একটু আগে সরিয়েছ, সেটা ভালয় ভালয় এখনই ফেরত দাও।'

আমার কথা শুনে গোবিন্দ প্রথমে আকাশ থেকে পড়ল। এবং এর পরেও যখন তাকে যথেষ্ট চাপ দিতে লাগলাম সে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল, 'এত বড় কথা ! আমি টাকা নিয়েছি ? আমি চোর ?'

এতদসত্ত্বেও যখন আমি গোবিন্দকে ছাড়লাম না তখন সে একটা আশ্চর্য কাজ করল। হঠাৎ বারান্দায় গিয়ে কোথা থেকে একটা ৫ টাকার নোট হাতে নিয়ে আমার কাছে এসে টাকাটা গুঁজে দিল, তার পর বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যখন এত জোর করছেন, আপনারও ৫ টাকা যাক, আমারও ৫ টাকা থাক। হাফ-হাফ, পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।'

বালখিল্য

বালখিল্য শব্দটির প্রকৃত অর্থ না জানায় অনেক সময়েই ছেলেমানুষি বলতে বালখিল্য শব্দটির ব্যবহার করা হয়। বলা হয়, যত সব বালখিল্য ব্যাপার। যেমন রসগোল্লা খাওয়ার প্রতিযোগিতা একটা বালখিল্য ব্যাপার। গিনেস বুক অফ রেকর্ডের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে অধিকাংশ রেকর্ড ভঙ্গকারী ঘটনাই ছেলেমানুষি বা বালখিল্য ব্যাপার। একনাগাড়ে সাতশ কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া, একটি সুপুরির পিঠে পৃথিবীর ইতিহাস লিখে রাখা সমাজ-সংসারের কোনও কেজো ব্যাপার নয়, নেহাতই বালখিল্য ব্যাপার।

বালখিল্য কথাটার কিন্তু অন্য মানে।

বালখিল্য এক ঋষি সম্প্রদায়। এঁদের সংখ্যা ষাট হাজার। পুরাণে এঁদের কথা আছে। আধুনিককালে পরশুরাম এঁদের নিয়ে চমৎকার গল্প লিখেছিলেন। 'কৃষ্ণকলি' গল্পসংগ্রহে আছে, আগে পড়া না থাকলে এখনও পড়ে নিতে পারেন, ভিন্ন স্বাদের সরস গল্প।

পুরাণের ঋষিরা প্রায়ই গোলমেলে হন। বালখিল্যরাও তাই। এবং এঁরা শুধু গোলমেলে নন, ভীষণ তেজস্বী। তবে বাদ সেধেছে তাঁদের আকার-আয়তনে, এঁরা লম্বায় পিগমি অথবা লিলিপুটের চেয়েও ছোট। মানুষের বুড়ো আঙুলের সমান উচ্চতা

বালখিল্যদের।

বালখিল্যদের বিষয়ে এর চেয়ে বেশি আমি জানি না। তবে রক্ষা এই যে নিবন্ধের নাম বালখিল্য হলেও, লিখব বালখিল্যতা বা ছেলেমানুষি বিষয়ে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন সস্ত্রীক নাটক দেখার সময় থিয়েটার হলে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে সেই থিয়েটার দলের কর্তা নাকি সদ্য বিধবা শোকাহতা প্রেসিডেন্ট পত্নীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা ম্যাডাম, মাননীয় প্রেসিডেন্টসাহেবের হত্যার ব্যাপারটা বাদ দিয়ে বলুন তো নাটকটা সত্যি আপনার কেমন লাগছিল ?'

ছেলেমানুষি জিজ্ঞাসার এটি একটি চমৎকার উদাহরণ। রাজা-বাদশা, মন্ত্রী-আমলা, রাজ্যপাল-রাষ্ট্রপতিরাও ছেলেমানুষি করেন। তবে ছেলেমানুষি গল্প ছেলেমানুষকে নিয়ে হলে ভাল হয়। বাবার সঙ্গে একটি বালক চিড়িয়াখানায় গিয়েছে। খাঁচার মধ্যে বাঘ গর্জন করছে। বালকটিকে খুবই চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল। কী যেন ভাবছে সে।

স্বভাবতই ছেলেটির বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রে খোকা, এত ভাবছিস কী ? বাঘের ডাক শুনে ভয় পেয়েছিস নাকি ?'

ছেলে সাহসীর মতো বলল, 'না বাবা, আমি মোটেই ভয় পাইনি। বাঘের ডাক তো আগেও আমি কতবার শুনেছি।'

বাবা বললেন, 'তা হলে এত ভাবছিস কী নিয়ে, এত চিন্তা কিসের ?'

ছেলে বলল, 'আমি চিন্তা করছি এই ভেবে যে ট্যাক্সিতে তো আর আমাকে একা নেবে না। ফিরব কী করে ?'

বাবা বললেন, 'তোকে একা ফিরতে হবে কেন ?'

ছেলে পরিষ্কার করে বলল, 'যদি খাঁচার দরজাটা খুলে এই বাঘটা বেরিয়ে এসে তোমাকে খেয়ে নেয়, আমি বাড়ি ফিরব কী করে ? ট্যাক্সিওলা তো আমাকে একা নেবে না। আচ্ছা বাবা, বাসে গেলে আমাকে কত নম্বর বাসে বাড়িতে যেতে হবে ?'

প্রকৃত ছেলেমানুষি গল্পের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হল এক ব্যস্ত লেখকের পৌত্রের কলম গিলে খাওয়ার কাহিনীটি। এই গল্প কয়েক বছর আগে বাজারে খুব চলেছিল। পারিবারিক ডাক্তারের কাছে হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা একটি ব্যাকুল টেলিফোন এল। ডাক্তারবাবু তখন খুব ব্যস্ত, চেম্বার ভর্তি রোগী। ফোন করেছেন বহু পরিচিত সেই লেখক,

'ডাক্তারবাবু, শিগগির করে আসুন।'

স্বভাবতই ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, কী ব্যাপার ?'

লেখক ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'ডাক্তারবাবু, আমি টেবিলে বসে পুজোর উপন্যাস লিখছিলাম। একটা জায়গায় একটু আটকে গিয়েছিল। ডটপেনটা প্যাডের ওপর রেখে চোখ বুজে প্লটটা একটু ভেবে নিচ্ছিলাম। এমন সময় কখন চুপিসাড়ে আমার দেড় বছরের নাতিটা এসে টেবিলের ওপরে হাত বাড়িয়ে আমার ডটপেনটা কিছু বোঝবার আগে তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে গিলে ফেলেছে।'

সব শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, 'এ তো খুব চিন্তার ব্যাপার হল। আমার চেম্বার ভর্তি রোগী, তবু যত তাড়াতাড়ি পারি আসছি।' তার পর একটু থেমে থেকে ফোন নামানোর আগে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপাতত আপনি কী করবেন ?'

ওপার থেকে লেখক বললেন, 'রাত আটটা বেজে গেছে। স্টেশনারি দোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর ডটপেন কোথায় পাব। একটি পেন্সিল দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। সম্পাদকমশায়কে বুঝিয়ে বলতে হবে।'

সরকারি বিভিন্ন ঘোষণার মধ্যে বিভিন্ন সময় বালখিল্যতা দেখা যায়। একটি বালখিল্য ঘোষণার নমুনা।

একটি মফস্বল শহরে দমকল অফিসের সামনে নীচের বিজ্ঞপ্তিটি দেখা গিয়েছিল :—

'অগ্নি-নির্বাপণ সপ্তাহ'

অগ্নি-নির্বাপণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আগামী তিরিশে জুন বিকালে স্থানীয় কলেজ প্রাঙ্গণে অগ্নি-নির্বাপণের মহড়া অনুষ্ঠান হইবে। জনসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিঃ দ্রঃ ওই সময়ে যদি প্রকৃতই কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এলাকায় ঘটে, তাহা হইলে অনিবার্য কারণে মহড়া বন্ধ থাকিবে।

আরেকটি নমুনা,

বন্যাপীড়িত অঞ্চলে হাইওয়ের ওপরে নোটিস বোর্ড :

'পথচারীগণ যদি দেখেন এই নোটিস বোর্ডটি জলে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিবেন গভীর জল, এ পথে অবশ্য আসিবেন না।'

বেআইনি

নববর্ষে কত লোক কত সুখ-দুঃখ, দেনা-পাওনা, স্মৃতি-বিস্মৃতির কথা বলবেন। পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা আর রঙিন ক্রোড়পত্র ভারী হয়ে উঠবে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনীতে। সভা-সমিতিতে সরব হবে আদর্শ ও আদর্শহীনতার আক্ষেপ।

এই সুযোগে আমি একটু বেআইনি কাজ করি। যাঁরা আমাকে চেনেন, তাঁরা সকলে এ কথা শুনে হাসছেন এই ভেবে যে, এই ছা-পোষা গৃহস্থ কতটুকু বেআইনি করার সাহস রাখে।

কথাটা সত্যি। আমার সাহস কম। আর বেআইনি কাজ করতে গেলে শুধু সাহস থাকলেই হবে না, যোগ্যতাও থাকা চাই। সেই যোগ্যতাই বা আমার কোথায় ?

আমি বরং এবার কয়েকটি বেআইনি কথোপকথনের কথা বলি। এগুলি মোটামুটি সবই আইনঘটিত এবং এর কোনওটাতেই আমার কোনও দায়িত্ব নেই। পাত্রপাত্রী, কুশীলব কিছুই আমি নই। সবই আমার শোনা কথা। এই রম্য নিবন্ধে আমি নিতান্তই কথাকার। এই অনুনাটিকাসমূহে আমার ভূমিকা বড় জোর থিয়েটারের প্রম্পটারের মতো।

প্রথম কাহিনীটি একেবারে আদালত কক্ষের মধ্যে। মাতলামির মামলা। এক পুলিশ এক মাতালকে ধরে এনেছে। পুলিশ আদালতে বলেছে যে আসামীকে যখন সে ধরে সে নিজেই স্বীকার করেছিল যে সে মাতাল।

পুলিশের এই জবানবন্দিতে যথেষ্ট সন্তুষ্ট না হয়ে আদালত পুলিশকে বললেন, আমি এই লোকটা সঠিক কী বলেছিল জানতে চাই।

পুলিশ বলল, বলছি তো আসামী বলেছিল যে, সে মাতাল।

আদালত বললেন, আরে তা নয়, ও কী কী বলেছিল বলুন। ও কি বলেছিল যে, আমি মাতাল !

আমতা আমতা করে পুলিশ বলল, হুজুর হয়তো আপনি মাতাল ছিলেন কিন্তু আসামী সে কথা বলেনি।

এবার বিচারক উত্তেজিত হয়ে বললেন, আপনি আদালতে আসামী সোপর্দ করতে এসেছেন অথচ আমার কথা বুঝতে পারছেন না। আমি সোজা জানতে চাইছি এই আসামী কি বলেছিল, আমি মাতাল ?

পুলিশ বিব্রতভাবে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, হুজুর আপনি মাতাল হতে পারেন, কিন্তু আসামী আপনার কথা কিছু বলেনি।

অতঃপর আদালতকে সাহায্য করতে আসামী পক্ষের উকিল উঠে দাঁড়ালেন। তিনি পুলিশকে প্রশ্ন করলেন, আপনি বুঝতে পারছেন না ? হুজুর জানতে চাইছেন, আমার মক্কেল কি নিজের মুখে বলেছিল, আমি মাতাল ?

এবার কাঠগড়ায় পুলিশ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, তার পর কাতরোক্তি করল, এ তো বড় বিপদ হল দেখছি। উকিলবাবু, আমি হলপ করে বলছি ও আপনাকে মাতাল বলেনি, হুজুরকে মাতাল বলেনি। ও শুধু বলেছে, 'আমি মাতাল।'

এই কথা শুনে উকিল ও আদালত সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মাতাল ?

পুলিশ সাক্ষী করজোড়ে বলল, হুজুরেরা আমি মাতাল নই, তবে এই রকম যদি আর কিছুক্ষণ চলে আদালত থেকে বেরিয়েই ভরপেট মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাব।

পুলিশ ও মাতালকে নিয়ে ঠিক এইরকম বেআইনি কথোপকথন আরও রয়েছে।

রাতের দিকে এক মাতাল রাস্তায় একটু এলোমেলো গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ঠিক দুর্ঘটনা ঘটছে না, তবে কেমন যেন উলটোপালটা ড্রাইভিং।

দূর থেকে দেখতে পেয়ে এক পুলিশ সার্জেন্ট এসে গাড়িটি দাঁড় করালেন। তার পর যথারীতি জিজ্ঞাসা করলেন, লাইসেন্স আছে ?

মাতাল ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত দিয়ে কাগজপত্র বার করে বললেন, হ্যাঁ আছে।

সার্জেন্টসাহেব আর ঝামেলা না বাড়িয়ে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, যান। সাবধানে গাড়ি চালাবেন।

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তার পর হঠাৎ কী মনে হতে ব্যাক করে সার্জেন্টের কাছে ফিরে এসে প্রশ্ন করলেন, কই, ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে চাইলেন, দেখলেন না তো।

অপ্রস্তুত সার্জেন্টসাহেব বললেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে আর দেখে কী করব ? না থাকলেই দেখি।

এবার আরেকবার আদালতের কক্ষে যাই।

সেই পুরনো দৃশ্য ; উকিলবাবু সাক্ষীকে জেরা করছেন। কিন্তু

সাক্ষী কেমন যেন ক্রমাগত সব আবোল-তাবোল বলছে। অবশেষে আর সহ্য করতে না পেরে উকিলবাবু বললেন, আপনি এ-সব কী যা তা বলছেন! আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বাড়ি কি হালিশহর? আপনি জবাব দিলেন, হালিশহরে দেখতে পেলে পা ভেঙে দেব। আপনাকে প্রশ্ন করলাম, এর আগে কখনও সাক্ষী দিয়েছেন কি না? তার উত্তরে আপনি কী না আমাকে প্রশ্ন করলেন, এর আগে কখনও ওকালতি করেছি কি না? এটা আদালত। ইয়ার্কির, পাগলামির জায়গা নয়। যা বলছি ঠিকঠাক জবাব দিন।

অভিযোগ শুনে সাক্ষী বললেন, ঠিকঠাক মাথায় বাঁশ দিয়ে মারব।

উকিলবাবু আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। উত্তেজিতভাবে বললেন, তুমি একটি ডাহা পাগল।

বিনিময়ে সাক্ষী উকিলকে বললেন, তুমি একটি ডাহা পাগল।

উকিলবাবু আবার বললেন, তুমি একটি ডাহা পাগল।

সাক্ষীও আবার প্রতিধ্বনি করলেন, তুমি একটি ডাহা পাগল।

এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সাক্ষী উকিলকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি প্রমাণ দেখাতে পারো যে তুমি পাগল নও।

একটু বেকায়দায় পড়ে উকিলবাবু বললেন, তুমি প্রমাণ দেখাতে পারো যে তুমি পাগল নও।

সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষী হাসতে হাসতে জামার বুকপকেট থেকে কাগজ বের করে আদালতের হাতে দিলেন।

স্তম্ভিত বিচারক অবাক হয়ে দেখলেন, সেটি একটি ডিসচার্জ সার্টিফিকেট। আগের দিনই সাক্ষীকে একটি মানসিক হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুনশ্চ :

একটি পুরনো বেআইনি কথিকা—

অনেক দিন আগের কথা। কালীঘাটের এক কাঁসা পিতলের বাসনের দোকান থেকে এক লট বড় বড় কাঁসার থালা চুরি গিয়েছিল। ঠিক সিঁদ কেটে বা গারদ ভেঙে চুরি নয়, দোকানের আলমারি থেকে কেউ সরিয়ে ফেলেছিল।

দোকানদার সন্দেহবশত দোকানের নবনিযুক্ত তরুণ কর্মচারীকে পুলিশে দেন। আলিপুর আদালতে মামলা ওঠে। সৌভাগ্যের কথা এক দয়ালু উকিলকে কর্মচারীটি পেয়ে যায়। তিনি সহানুভূতিবশত প্রায় বিনা পয়সায় মামলাটি লড়েন এবং সেই কর্মচারীকে মুক্ত

করেন।

খালাস হওয়ার পর কর্মচারী উকিলকে বলল, উকিলবাবু আমার জন্য এত করলেন, আমি আপনাকে কী যে দিই। উকিলবাবু বললেন, অসুবিধে না হলে তুমি আমার এক দিনের ফি চৌষট্টি টাকা দিয়ো। কর্মচারীটি বলল, হুজুর আমার তো নগদ টাকা নেই। তার বদলে আমি যদি আপনাকে কয়েকটা কাঁসার থালা দিই!

গুরু-শিষ্য সংবাদ

এবারের আলোচনা লেখাপড়া, পড়াশুনা নিয়ে।

অবশ্য এ সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাপারে আমার মাথা না গলানোই উচিত। লেখাপড়া, পড়াশুনা আমার বিশেষ কিছু নেই। আমার বিদ্যের দৌড় আমার ক্লান্ত পাঠকদের অজানা নয়, সেটা লুকোনো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তবে ওই লেখাপড়ার লেখাটা কিছুটা অভ্যাসবশত, কিছুটা অর্থলোভে একটু আধটু এখনও করে যাচ্ছি। সে সব লেখা পাঠ করে অনেকেই যে হাস্য সংবরণ করতে পারেন না, সে সংবাদও আমার জানা আছে। আমার সম্পাদকেরাও জানেন, তাই মাঝে মধ্যে আমার তত্ত্বতালাস করেন।

সে সব কথা এখন থাকুক। সে সব দুঃখের কথা বলতে গেলে সাতকাহন, ফুরোবার নয়। যে জন্যে আমার লেখা, সেই হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গ-রসিকতা তা হলে জমবে না।

আমরা সরাসরি লেখাপড়ার আলোচনায় যাচ্ছি। লেখা পড়া মানে ছাত্র-মাস্টারমশায়, গুরু-শিষ্যের কথা।

লেখাপড়ার গল্প প্রথমে একটা ইস্কুল দিয়ে শুরু করি। একটি ইস্কুলের ছাত্র তার মাস্টারমশায়কে একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, 'স্যার স্কুল আমার একদম ভাল লাগে না। অথচ ভেবে দেখুন অন্তত ষোলো বছর বয়েস পর্যন্ত এই স্কুলে আমাকে থাকতে হবে!'

মাস্টারমশায় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'একবার ভেবে দ্যাখো আমার কথা। আমারও তো স্কুলটা একদম ভাল লাগে না, অসহ্য লাগে। অথচ আমাকে এখানে ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বয়েস পর্যন্ত থাকতে হবে।'

এই গল্পেরই একটা রকমফের আছে। এ গল্পটা শৈবালের গল্প।

একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে শৈবাল বলল, 'মা, আমি ইস্কুলে যাব না।'

বলা বাহুল্য শৈবাল এরকম মাঝেমাঝেই করে।

শৈবালের মা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কেন যাবে না ?'

শৈবাল বিরক্তিভরা গলায় বলল, 'কেন আবার কি ? আমার ইস্কুলে যেতে ভাল লাগে না।'

শৈবালের মা আবার শীতল গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ভাল লাগে না ?'

শৈবাল বলল, 'ইস্কুলের ছেলেরা আমাকে একদম পছন্দ করে না। ইস্কুলের মাস্টারমশায়রাও আমাকে পছন্দ করেন না। দারোয়ান, বেয়ারা, দপ্তরি কেউ আমাকে দেখতেপারে না আমি ইস্কুলে কিছুতেই যাব না।'

এতক্ষণে শৈবালের মা বললেন, 'না তা হতে পারে না। শৈবাল এ সব তোমার মন গড়া কথা। তা ছাড়া তুমি তো বাচ্চা ছেলে নও। তোমার চল্লিশ বছর বয়েস হয়েছে। আর তুমি হলে ইস্কুলের হেডমাস্টার, তোমার না গেলে চলবে ?'

ইস্কুল বিষয়ক এরকম দুটো গোলমেলে গল্প লেখার পর একটু তত্ত্বকথা বলি।

ভিক্টর হুগো বলেছিলেন, 'একটা ইস্কুল খোলা মানে হলো একটা জেলখানা বন্ধ করে দেয়া।'

কথাটার অর্থ সুদূর প্রসারী। লেখাপড়া শিখলে মানুষ দুষ্কর্ম করবে না, অপরাধ করবে না ফলে তাকে জেলে যেতে হবে না।

তবে আজকাল যখন দেখি লেখাপড়া করা, বিদ্বান, শিক্ষিত ভদ্রলোক কত রকম অবর্ণনীয় অপরাধ করছে জাল জোচ্চুরি, ঘুষ, বধূহত্যা, ধর্ষণ তখন কেমন যেন খটকা লাগে।

একটা পুরনো কালের বিলিতি প্রবাদ বাক্য ছিল যে সব মানুষের প্রকৃতিই একরকম, শুধু লেখাপড়াই তাদের আলাদা করে তোলে, স্বতন্ত্র করে গড়ে।

এই সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে আর একটা কথাও মনে পড়ছে। মূল কথাটি কার জানি না, তবে আমরা আমাদের এক অধ্যাপকের কাছে শুনেছিলাম। তিনি কিছুদিন আগে বিগত হয়েছেন। এই সূত্রে তাঁকে স্মরণ করে কিঞ্চিৎ স্মৃতি তর্পণ করছি।

কথাটা অবশ্য স্মরণযোগ্য।

অধ্যাপকমহোদয় বলেছিলেন, লেখাপড়ার উদ্দেশ্য নয় বড় উকিল কিংবা ভাল ডাক্তার বা এঞ্জিনিয়ার অথবা বড় নেতা বানানো, লেখাপড়ার উদ্দেশ্য একটাই সেটা হল মানুষ বানানো, মানুষের মতো মানুষ বানানো ।

এ সম্পর্কে শেষ আপ্তবাক্যটি লিখে তার আবার সরস কথিকায় প্রবেশ করব ।

রাস্তাঘাটে বইয়ের ভারে নুব্জ্য হয়ে, ক্লান্ত অক্ষম পায়ে শিশুর দল বিদ্যালয় থেকে যাতায়াত করছে। খাতা বইয়ের ঝোলা তাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে, তাদের মুখে হাসি নেই, তাদের চলনেবলনে শিশুসুলভ চঞ্চলতা নেই ।

দেখলে মায়া হয়। এদের অমল শৈশব কত দুঃখে, কত কষ্টে কাটছে ।

আর কে লক্ষ্মণের একটা পুরানো কার্টুনের কথা মনে পড়ছে। একটা ছয়-সাত বছরের ছেলেকে নিয়ে তাঁর বাবা হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে স্তম্ভিত হয়ে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর হেডমাস্টার মশায় গম্ভীরভাবে সেই ভদ্রলোককে বলছেন, 'আপনার ছেলেকে ক্লাসে তোলা যাবে না। এর প্রমোশন হবে না। ও ইংরেজি, সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, অঙ্ক, জীববিদ্যা এই সব বিষয়ে খুব খারাপ করেছে ।

কিন্তু এতটুকু ছেলে এত সব লিখবে কী করে ? আর শিখেই বা কী লাভ হবে ? দুদিনের মধ্যেই ভুলে যাবে, যেতে বাধ্য। তখন আবার নতুন করে শিখতে হবে ।

এই সূত্রেই আমার শেষ আপ্তবাক্যটি ।

একটা সরু গলা শিশির মধ্যে তাড়াতাড়ি যদি জল ভরার চেষ্টা করো, দেখতে পাবে জল ভেতরে প্রায় কিছুই যায়নি। প্রায় সবটাই উপচিয়ে পড়ে গেছে ।

তেমনিই একটি শিশুকে জোর করে তাড়াতাড়ি অনেক কিছু গলাধঃকরণ করাতে যাও, দেখবে কিছুইসে খাচ্ছে না, খেতে পারছে না। জোর করে চাপানো সব খাদ্য উপচিয়ে বাইরে পড়ে যাচ্ছে, তার অন্তরে কিছু ঢুকছে না ।

তবে শিক্ষা মানে শুধু বই পড়া নয় ।

একটা আমেরিকান কাহিনী জানি। শিকাগো শহরের এক বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ফ্রান্সিস ওয়েল্যান্ড পার্কার, সেই পার্কার সাহেবকে এক মহিলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা স্যার, আমার বাচ্চার শিক্ষাদান

আমি কবে থেকে শুরু করব ?'

পার্কার প্রশ্ন করলেন 'আপনার বাচ্চা কবে জন্মাবে ?'

মহিলা হেসে বললেন, 'জন্মাবে কী ? তার তো এখন পাঁচ বছর বয়েস।'

পার্কার বললেন, 'তা হলে আর সময় নষ্ট করবেন না। জীবনে শ্রেষ্ঠ পাঁচটা বছর এর মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যান। বাচ্চার শিক্ষা শুরু করে দিন।'

শিক্ষা শুরু হল। এবার তবে ইস্কুলে যাই।

ইস্কুলের গল্প মানে পরীক্ষার গল্প। পরীক্ষার নম্বর নিয়ে গল্প।

এ বিষয়ে আমার নিজের একটা অতি পুরানো পচামার্কা গল্প আছে। গল্পটা আগে যাঁরা পড়েছেন, দয়া করে নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

এই ভগ্নকাহিনী অন্যের পক্ষে যথেষ্টই হাসির, আমার পক্ষে খুবই দুঃখের।

জীবনের অন্যান্য পরীক্ষার মতোই স্কুলের পরীক্ষাতেও আমি কখনও কখনও শূন্য পেতাম। অঙ্কের খাতায় এক সময় এটা বাঁধাধরা ব্যাপার হয়েছিল।

একবার ওইরকম শূন্য পেয়ে, যাকে ছোট বয়সে আমরা বলতাম গোল্লা, তাই পেয়ে বাড়ি এসে দেখি বাবা অগ্নিমূর্তি, কী করে ভাইদের কাছে আগেই জেনে গেছেন যে আমি জিরো পেয়েছি।

বাড়ি পৌঁছানো মাত্র বাবা আমাকে এই মারেন কি সেই মারেন। সেই যাত্রা আমার পরম স্নেহশীলা পিসিমা আমাকে রক্ষা করেন তাঁর একটি প্রবাদপ্রতিম উক্তির দ্বারা।

উক্তিটি হল, 'শুধু শুধু খোকাকে মারতে যাচ্ছ কেন ? খোকা একেবারে কিছু যে পায়নি তাতো নয়, জিরো তো পেয়েছে।'

পরীক্ষায় জিরো পাওয়া নিয়ে অন্য একটা গল্প আছে। সেটা অবশ্য এত মজার নয়, তবু বলা যেতে পারে।

পরীক্ষার খাতায় গোল্লা পেয়ে একটি দুঃখিত ছাত্র অধ্যাপককে বলেছিল, 'কিন্তু স্যার, আমি তো কখনও ভাবতে পারি না যে আমি গোল্লা পাওয়ার উপযুক্ত।'

পরীক্ষক মহোদয় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খাটো গলায় বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ জিরোর নীচে কিছু নেই বলে তোমাকে জিরোর থেকে কম দিতে পারলাম না।'

পরীক্ষার নম্বর নিয়ে আরও একটা গল্প মনে পড়ছে। সেটা অবশ্য

ভালর দিকে।

টিউটোরিয়াল ক্লাসে অধ্যাপিকা পরীক্ষার খাতা ফেরত দিয়ে ছাত্রীকে বললেন, 'আমার ইচ্ছে ছিল যে তোমাকে আশ মিটিয়ে নম্বর দিই।'

ছাত্রীটি খাতা নিয়ে দেখে যে সে পঁচাশি পেয়েছে। তখন সে খাতাটাকে দিদিমণির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দিদিমণি আপনার আশা অপূর্ণ রাখবেন কেন, পঁচাশি যখন দিয়েছেন ; আর মাত্র পনেরো দিয়ে পুরো একশোই করে দিন।'

একশো অবশ্য কেউ কখনও পায় না। পায় না বলা ঠিক হচ্ছে না। এখন পায় কিনা জানি না, আমাদের সময় পেত না। মাস্টারমশায়দের কে যেন মাথার দিব্যি দিয়ে চেখেছিল একশো দেয়া যাবে না। এক বা দুই কমিয়ে নিরানব্বুই বা আটানব্বুই দেয়া হত শতকরা একশোভাগ শুদ্ধ খাতায়। এই মানসিক দীনতার এই কৃষ্টি-কৃপণতার কী ব্যাখ্যা তা অবশ্য আমি জানি না।

এই প্রসঙ্গে সাড়ে তিন দশক আগে আমরা যারা ছাত্র ছিলাম তাদের অভিজ্ঞতা একটু স্মরণ করি। আমার মনে হয়, আশঙ্কা হয় সে প্যাটার্ন এখনও বদলায়নি, এখনও রয়েছে। আমার বাপ-ঠাকুর্দার আমলেও সেই একই প্যাটার্ন নাকি ছিল। কয়েকবছর আগে আমার ছেলের আমলেও সেই একই নম্বরদান প্রণালী দেখেছি।

বলা বাহুল্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি। নতুন কালের অর্বাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে আমার ধারণা শূন্য, জিরো এবং গোল্লা।

অনার্স এবং এম এ দুটোই এখন আট পেপার, এক সময়ে যথাক্রমে ছয় ও আট পেপার ছিল।

সে যা হোক ছকটা পরিষ্কার।

প্রত্যেক পেপার বা পত্রে একশো নম্বর। প্রত্যেক পত্রের দুটো করে অংশ, তাকে বলা হয় হাফ, মানে প্রত্যেক পেপারে দুই হাফ। প্রত্যেক হাফে পাঁচটা করে প্রশ্ন, তার মধ্যে যে কোনও তিনটে উত্তর, দিতে হবে।

প্রত্যেক পেপারে একশো নম্বর অর্থাৎ হাতে পঞ্চাশ। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রশ্নে মোট নম্বর হল ১৬.৬৬৬৬৬৬..., পুরো ছয়টি প্রশ্নের নম্বর যোগ দিলে তখনও দশমিক শূন্য শূন্য চার কম থাকছে, হৃদয়বান প্রশ্নকর্তারা অবশ্য এই খামতি পূরণের জন্য অবশিষ্ট নম্বরটুকু পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা বা বিচক্ষণতার জন্যে নির্দিষ্ট করতেন।

তবে সে-ও নিতান্ত চক্ষুলজ্জার জন্যে।

কারণ ষোলো, সাড়ে ষোলো থেকে পৌনে সতেরো নম্বর সীমা যাই হোক, যে যতই ভাল লিখুক তাকে কোনও প্রশ্নে দশের বেশি দেওয়া হত না।

একদম লটারি খেলা। আট-দুগুণে ষোলোটা অর্ধপত্র মানে হাফে প্রতিটি প্রশ্নে দশ করে পেয়ে শতকরা ষাট পেলে তবে তবে প্রথম শ্রেণী।

বিনা কারণে বেশি কথা হয়ে গেল। কিন্তু এখানে তো শেষ করা যায় না। রম্যরচনাকে সমস্যা জর্জরিত অথবা জিজ্ঞাসা চিহ্নিত করার পাপ আর যেই করুক আমি নিশ্চয় করব না।

সুতরাং এইটি শেষ গল্প।

গল্পটি আমার নিজের।

একটি অপাপবিদ্ধ শিশু প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় একতলার সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় আমার কাছে আসে। তার বয়েস ছয় সাত।

আমি একটি ক্ষীণ প্রশ্ন করি, 'তুমি এলে, তোমার বাবা মা কী করছেন।'

মেয়েটির নাম নিনো, সে গোল গোল চোখ করে বলে, 'কী আর করবে আমার হোমওয়ার্ক করছে'।

আমি বলি, 'দুজনে করছে কেন ?'

নিনো বলে, 'কে ঠিক করবে তা কি আমি জানি ?'

আমি বলি, 'তবে ?'

নিনো বলে, 'তাই নিয়েই তো গোলমাল মা বলে, আমার হোম ওয়ার্ক ঠিক, বাবা বলে আমার ?'

আমি বলি, 'তবে ? নিনোদেবী, তুমিই আমার বাবা মায়ের সব গোলমালের কারণ।'

নিনো একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'তা কেন ? বাবামায়ের কোনও বিষয়েই তো মিল নেই।'

প্রবীণ ও নির্বোধ তারাপদ রায়, মানে আমি, অনেকক্ষণ নিনোর দিকে তাকিয়ে থাকি, তারপর তাকে বলি, 'তোমার বাবা-মা-র কোনও বিষয়েই মিল নেই ?'

নিনো করুণ চোখে তাকাল তারপর বললে, 'জেঠু, একটা বড় মিল আছে, আমার বাবামায়ের একই দিনে বিয়ে হয়েছিল।'

ভুলোমন স্বামী

ভুলোমন অধ্যাপক নিয়ে অনেক রকম গল্প আছে। সেই অধ্যাপকদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকেই বিবাহিত এবং তাঁদের স্ত্রী বিদ্যমান।

স্বামীদেবতা যদি ভুলোমন হন, সেটা পত্নীঠাকুরানীর পক্ষে সুবিধেজনক হয় না অসুবিধেজনক হয় এরকম জটিল প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে প্রথমে একটি নিরতিশয় সরল প্রকৃতির ভুলোমন স্বামীর গল্প বলি। একদিন এই ভুলোমন স্বামী বাড়ি থেকে হনহন করে বেরিয়েছেন, একটা বিশেষ জরুরি দরকারে তিনি কোথায় যেন তাড়াতাড়ি ছুটে যাচ্ছেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মোড়েই এক ডাক্তারের চেম্বার। পাড়ার পুরানো ডাক্তার, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে রীতিমতো বন্ধুত্ব রয়েছে ভদ্রলোকের। হনহন করে ডাক্তারের চেম্বারের মধ্যে প্রবেশ করলেন ভদ্রলোক। ভর দুপুর। ডাক্তারখানা একদম খালি। ডাক্তার বাবু একা-একা বসে ঝিমোচ্ছিলেন, হঠাৎ ভদ্রলোকের প্রবেশে তিনি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন, খুশিও হলেন। রাস্তার ধারে ফুটপাথের একটা দোকানে একটা হাঁক দিয়ে দু'ভাঁড় আদা-চা আনতে বলে ডাক্তারবাবু ভদ্রলোককে 'আসুন, আসুন' বলে স্বাগত জানালেন।

গনগনে দুপুরে উষ্ণ চায়ের পাত্রে চুমুক দিয়ে দু'জনের আড্ডা জমে উঠল। কলকাতার ফুটবল মরসুমে দলবদল, খলনায়কের অশ্লীল গান, ইলিশের চড়া দাম, পুজো এসে গেল ইত্যাদি বিষয়ে আধঘণ্টাখানেক আলোচনার পর ভদ্রলোক উঠলেন, সেই সময় ডাক্তারবাবু মামুলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমনিতে সব ভাল তো? বাড়িতে বউদি ভাল আছেন?' দ্বিতীয় প্রশ্নটি শোনামাত্র ভদ্রলোক ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লেন, ডাক্তারবাবুকে বললেন, 'সর্বনাশ, আমি তো একেবারে গিয়েছিলাম, আমি তো আপনাকেই ডাকতে এসেছিলাম।'

বিস্মিত ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?' ভুলোমন স্বামী বললেন, 'আর কেন? আপনার বউদি বাসায় ফিট হয়ে পড়ে আছেন। আপনাকেই ডাকতে এসেছিলাম। এতক্ষণে কেমন আছে কে জানে, এখন তাড়াতাড়ি চলুন।'

সুখের কথা, এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর জ্ঞান একা একাই ফিরে এসেছিল,

চিকিতসার জন্যে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি।

ভূ.ম., স্বামীর এর পরের গল্পটি অবশ্য অবিশ্বাস্য এবং আরও গোলমেলে। ঘটনাটি নাকি কোনও এক বছর শারদীয়া পুজোর আগে। ভদ্রলোক বাজারে গিয়েছিলেন। হাতে একটা বিরাট লিস্টি। সেই লিস্টিতে জামা, কাপড়, জুতো, মোজা, স্টেশনারি জিনিস, প্রসাধন দ্রব্যাদি সবই রয়েছে। সব কিনে-কেটে তিনি একটা ট্যাক্সি ধরলেন কিন্তু তাঁর মনে হল তিনি কী যেন একটা ফেলে যাচ্ছেন। হাতের লিস্টির সঙ্গে নতুন কেনা প্যাকেটগুলো দুবার-তিনবার মেলালেন। না, সবই তো ঠিকই আছে, কিছুই তো ফেলে আসেননি। পকেটে হাতড়িয়ে দেখলেন মানিব্যাগ, কলম, রুমাল, সিগারেট, দেশলাই সবই ঠিকঠাক আছে। অবশ্য তাঁর মনে বারবার খটকা লাগছে, কী যেন ফেলে এসেছেন মনে হচ্ছে। সমস্যার সমাধান হল বাড়ি ফিরে। ট্যাক্সি থেকে জিনিসপত্র নিয়ে নামামাত্র মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, মা কোথায় ?' ভূ.ম., স্বামী দোকানে-বাজারে কোথায় যে স্ত্রীকে ফেলে এলেন কে জানে।

অন্য একজন ভূ.ম., স্বামীর কথা বিলক্ষণ জানি। তিনি আমাদের খুব কাছের লোক, তাঁর স্ত্রীও আমাদের নিজের লোক। এই ভূ.ম., স্বামী ভদ্রলোকটি একজন চূড়ান্ত চুরুটখোর। কখনও তাঁর চুরুটের আগুন নেভে না। একদিন ভদ্রলোক এয়াল না করে অ্যাশট্রেতে রাখা জ্বলন্ত চুরুট হাতে তুলে আগুনের দিকটা নিজের মুখে গুঁজে দেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট পুড়ে গিয়ে আর্ত চিৎকার করে চুরুটটা মাটিতে ফেলে দেন।

এই ঘটনার সময় তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছেই ছিলেন। পরে ভদ্রমহিলা স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ভাগ্যিস তুমি মুখে দেওয়া মাত্র ভুলটা বুঝতে পারলে, তাই শুধু ঠোঁটটার ওপর দিয়ে গেছে, না হলে মুখের ভেতর জিবটিব, তালুটালু পর্যন্ত পুড়ে যেতে পারত।' সেই অর্থে ভুলোমন আমরা সকলেই। আমরা প্রয়োজনীয় লোকের ঠিকানা ভুলে যাই, ফোন নম্বর হারিয়ে ফেলি। শ্যালিকার ননদের নাম ভুলে যাই। আমরা ট্রামে কিংবা রেস্তোঁরায় ছাতা ফেলে আসি, ইন্সিরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে ভুলে যাই। তবে সবচেয়ে বেশি ভুল হয় বোধহয় চিঠি পোস্ট করতে। লোকে লেখা চিঠি পকেটে ভরে নিয়ে পোস্ট না করে বাসায় ফিরে আসে, তখন পকেটের মধ্যে আবিষ্কৃত হয় ডাকে না ফেলা জরুরি পত্রটি।

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের নায়ককে তাঁর স্ত্রী চিঠি ডাকে দিতে

দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেই রাস্তায় বেরিয়েছেন সবাই তাঁকে বলতে লাগল, 'দাদা, বৌদির চিঠিটা পোস্ট করতে ভুলবেন না।' বাসেও তাই হল, অফিসেও তাই হল, এমনকী চিঠিটা ডাকে ফেলে দেওয়ার পরেও চেনা-অচেনা লোকেরা তাঁকে বলতে লাগল, 'দাদা, বৌদির চিঠিটা পোস্ট করেছেন তো?' এর কারণ অবশ্য আর কিছু নয়, ভদ্রলোকের জামার পিঠে তাঁর স্ত্রী আলপিন দিয়ে গেঁথে একটা কাগজে লিখে দিয়েছিলেন, 'আমার বরের খুব ভুলোমন, ওঁকে দয়া করে আমার চিঠিটা পোস্ট করতে মনে করিয়ে দেবেন।' অবশেষে চিঠি ডাকে দেওয়ার কথোপকথন দিয়ে ভুলোমন কাহিনী শেষ করি।

স্ত্রী : আমার চিঠিটা পোস্ট করেছ?

স্বামী : না।

স্ত্রী : পোস্ট করোনি। অথচ তোমাকে আমি পইপই করে বলেছিলাম।

স্বামী : কিন্তু।

স্ত্রী : কিন্তু আবার কী? আমার জরুরি চিঠিটা তুমি পোস্ট করলে না?

স্বামী : কিন্তু দোষ আমার নয়, দোষ তোমার।

স্ত্রী : আমার আবার কী দোষ?

স্বামী : চিঠিটা দ্যাখো। তুমি চিঠিটার ঠিকানা লেখনি।

চোর-চোর

চোর-পুলিশ তথা চোর-চোর বালক-বালিকাদের অতিপ্রিয় খেলা। অল্প বয়েসে চোর-পুলিশ খেলেনি এমন মানুষ পাওয়া যাবে না।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে আমাকে অনবরতই চোর হতে হত। পুলিশের ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ কদাচিৎ পেয়েছি। সুকুমার রায়ের 'হযবরল'তে ন্যাড়াকে যেমন ভুলিয়েভালিয়ে কাঠগড়ায় তোলা হয়ে হয়েছিল, আমাকেও বোধহয় সেই রকম বার বার ভুলিয়েভালিয়ে চোর বানানো হত।

এতদিন পরে সব কথা আর বিশদভাবে মনে পড়ে না, কেন

আমাকেই চোর হতে হত, কী কৌশলের ফলে আমাকে অপদস্থ হতেই হত—এখন আর বুঝে উঠতে পারি না।

নীতিকাহিনীতে আছে জনৈক তস্কর গ্রামের লোকের তাড়া খেয়ে ছুটে পালিয়ে এক বেলতলায় সন্ন্যাসী সেজে গায়ে ছাই মেখে আত্মগোপন করে। সেই যে লোকগুলো তাকে এতক্ষণ তাড়া করছিল তারাই বেলতলায় তাকে সন্ন্যাসীবেশে দেখে গড় হয়ে প্রণাম করতে থাকে।

এই ঘটনায় চোরের মনে ভাবান্তর হয়। সে ভাবতে থাকে সন্ন্যাসী সাজলেই যদি এত সম্মান পাওয়া যায় প্রকৃতই সন্ন্যাসী হয়ে গেলে আরও কত কী পাব।

আমার ক্ষেত্রে অবশ্য প্রসঙ্গটি বিপরীত। চোর থেকে সন্ন্যাসী নয়, আমাকে বার বার চোর সাজতে হয়েছে। বালক বয়েসের সেই মর্মান্তিক স্মৃতি আজও আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। আদালতের কাঠগড়ায় অভিযুক্ত বিচারের শেষভাগে হাকিমকে জানাল, 'হুজুর, আমি আমার দোষ কবুল করছি। আমি সত্যিই চুরিটা করেছিলাম।'

হাকিম অবাক, 'একথা আগে বলেননি কেন? শুধু শুধু একটা দুটো দিন নষ্ট হল। শুনানির আগে বলতে পারতেন।'

আসামী হাতজোড় করে বলল, 'হুজুর, তখন আমি ভেবেছিলাম আমি নির্দোষ। কিন্তু এই দুদিনে আপনার এজলাসে শুনানির পর সাক্ষীদের কথা শুনে, উকিলবাবুদের বক্তৃতা শুনে আমার সে ভুল ভেঙে গেছে। আমি এখন নিঃসন্দেহ যে, আমি চুরি করেছিলাম।

আমাকে নাবালককালে যে পরিমাণ চোরের ভূমিকায় খেলতে হয়েছিল সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে এতদিনে হয়তো আমার চৌর্যপরায়ণতা সম্পর্কে আমার মনে কোনও খটকা থাকত না।

আত্মকাহিনী থাক। শুধু কবুল করে রাখি, চুরি আমি কিছু কম করিনি, এর গল্প, ওঁর লেখা, তার গুজব, বাংলা-ইংরেজি-দেহাতি, নতুন-পুরানো আমার চুরির সিজিওর লিস্ট (Seizure List) বানাতে গেলে সে মহাভারতের চেয়ে বড় হতে পারে।

এখন আরো গোলমাল দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন হল লক্ষ করছি আমি আমার নিজেরও পুরনো লেখা থেকে চুরি করে যাচ্ছি। স্বভাব খারাপ হয়েছে। কী আর করা যাবে?

তবুও সাহিত্যসমালোচকদের কাছে আমার একটি বিনীত জিজ্ঞাসা, নিজের পূর্ব রচনা থেকে চুরি করা, নিজের লেখা টোকা প্লেজিরায়িজমের পর্যায়ে পড়ে কিনা।

এই জিজ্ঞাসার জবাব সুধী সমালোচকেরা ভাবতে থাকুন ততক্ষণ আমরা আসল চোরের গল্পে যাই।

বাসে পকেট মারতে গিয়ে এক চোর ধরা পড়েছিল। সে একটি মোটা মানিব্যাগ তুলে নিয়েছিল এক যাত্রীর পকেট থেকে, সেই পেটফোলা ব্যাগে টাকা ছাড়া আর সবই ছিল, ঠিকানা-ফোন নম্বর লেখা কাগজ, চিরকুট, লন্ড্রির রসিদ, ক্যাশমেমো, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, খবরের কাগজের কাটিং এবং সর্বশেষ সাকুল্যে একটি দুটাকার এবং একটা এক টাকার কয়েন।

আদালতের বিচারে আসামীর দেড়শ টাকার ফাইন হল। পরের সপ্তাহেই আবার আসামীকে দেখা গেল আদালতের কাঠগড়ায় অন্য এক পকেট মারার কেসে। হাকিম ধমক দিলেন, 'তুমি আবার পকেট মেরেছ ?'

আসামী বলল, 'কী করব স্যার ? তিন টাকা আয়ে যদি দেড়শো টাকা ব্যয় হয়। তা হলে তো একেকবার ধরা পড়ার পরে পঞ্চাশবার পকেট মারতেই হবে।'

অকাট্য যুক্তি। এরকম আরেকটি মামলায় বিচারক আসামীকে বলেছিলেন, 'দ্যাখো, গত তিন বছরে আমি তোমাকে আমার এজলাসে অন্তত দশবার পেলাম।'

আসামী বলল, 'হুজুর আপনি নিজে তো রোজই আসেন, আমি তো দুমাস-চারমাসে একবার।'

এই রকমই অন্য কাহিনীতে চোরকে নাকি হাকিম ওই একই কথা বলায় চোর জবাব দিয়েছিল, 'হুজুর, যদি প্রমোশন না হয়, আমি কী করতে পারি।

অতঃপর দুটি খুবই পুরনো গল্প। বলাবাহুল্য, ভাল গল্প কখনওই পুরানো হয় না—

(এক) খালাস হয়ে যাওয়ায় কৃতজ্ঞ চোর উকিলকে বলল, 'বাবু আপনার বাড়িতে একদিন যাব।'

উকিলবাবু বললেন, 'দিনের বেলায় এসো।'

(দুই) উকিলবাবুকে এক অপরাধী বলল, 'হুজুর আমি একটা কেসে ফেঁসে গেছি।'

উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী কেস ?'

অপরাধী বলল, 'হুজুর, আমি এক কেস বিলিতি মদ চুরি করেছিলাম।'

উকিলবাবু বললেন, 'কেসটা নিয়ে এসো।'

শরীর ও স্বাস্থ্য

শরীর ও স্বাস্থ্য বিষয়ে চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন ভলতেয়ার। ভলতেয়ার বলেছিলেন, 'একটা জাতির ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করে সে জাতির প্রধানমন্ত্রীর হজম ঠিক হচ্ছে কি না তার ওপর।' অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী যদি পেটের গোলমালে ভোগেন, তিনি এমন অনেক গোলমেলে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা তিনি সুস্থ থাকলে, তাঁর শরীর ভাল থাকলে অবশ্যই নিতেন না।

শোনা যায় কায়েদে আজম জিন্না জেনে গিয়েছিলেন যে তাঁর টার্মিনাল ক্যান্সার হয়েছে। তাঁর পরমায়ু সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। তাই তিনি তড়িঘড়ি দেশ ভাগ করিয়ে পাকিস্তান বানালেন যাতে ওই নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হতে পারেন। দ্রুত মৃত্যু এসে তাঁর সাধ অসম্পূর্ণ করে দেবে এই চিন্তা জিন্না সাহেবের না থাকলে হয়তো শেষে পাকিস্তান সৃষ্টি নাও হতে পারত।

আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, শরীরই প্রথম শরীরই আদ্য। শরীর ভাল না থাকলে, অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়, কিছুই কিছু নয়। শরীর ও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর জ্ঞান রাখেন। এ-বিষয়ে কথা না বাড়িয়ে অপ্রাসঙ্গিক নয় এমন একটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করছি। বিষয়বস্তু হল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটা বক্তৃতা।

নয়াদিল্লিতে একটি নতুন সরকারি হাসপাতালের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন মাননীয় মন্ত্রী। তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বললেন, 'আমি গর্বিত যে চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের দেশ এখন সর্বোচ্চ মানে পৌঁছেছে। ইউরোপ-আমেরিকায় বড় বড় বিখ্যাত হাসপাতালে যেরকম চিকিৎসার বন্দোবস্ত রয়েছে, আমাদের বহু হাসপাতালেই সেরকম বন্দোবস্ত রয়েছে। বড় ডাক্তার, সার্জন, উন্নতমানের যন্ত্রপাতি সবকিছুই আমাদের রয়েছে। বলতে গেলে এমন কোনও কঠিন রোগ নেই যার চিকিৎসা আমাদের দেশে ভালভাবে করা যায় না। এ-বিষয়ে আমি আরও বিস্তারিত আপনাদের বলতে পারতাম। কিন্তু আজ কিছুদিন হল আমি কোমরের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছি। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারি না, বসে থাকলেও কষ্ট হয়। আমি আজ বিকালের প্লেনেই লন্ডন যাচ্ছি, সেখানে ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাতে। আশা করি আপনাদের আশীর্বাদে সেখান থেকে যথাসময়ে

সুস্থ হয়ে ফিরে আসব। ...' মন্ত্রীমশায় চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে বিলেত থেকে ফিরে আসুন। এই ফাঁকে আমার ডাক্তারদের ক্লাবে একটু যেতে পারি।

এক প্রবল ঝড়-বাদলের দিনে ডাক্তারবাবুদের ক্লাবে সন্ধ্যাবেলায় মাত্র তিনজন সদস্য এসেছেন। কিন্তু চারজন না হলে তাঁদের জুটি মেলে না। তখন অন্য এক ডাক্তার বন্ধুকে তাঁরা ফোন করলেন। বন্ধুটিও ফোন পেয়ে তখনই তৈরি হয়ে বাড়ি থেকে রওনা হলেন।

রওনা হওয়ার মুখে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী স্বভাবতই জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার ? এই দুর্যোগের সন্ধ্যাবেলা কোথায় যাচ্ছ ?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'শুনলে না, এই মাত্র ফোন এল।' স্ত্রী বললেন, 'কীসের ফোন ? কী ব্যাপার ?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তিনজন ডাক্তার এর মধ্যে চলে গেছে, আমাকেও যেতে হবে। এই বলে ডাক্তারবাবু ঝড়-জল মাথায় করে বেরিয়ে পড়লেন।

ডাক্তারবাবু তাস খেলতে যান, ততক্ষণ আমরা নিজের চিকিৎসা নিজে করি। সবাই জানেন, সর্দির চিকিৎসাই সবচেয়ে কঠিন, কারণ সত্যিই এর কোনও ওষুধ নেই। তবে আমাকে আমার এক বিশেষ বন্ধু বলেছিলেন, 'জানো সর্দি হলেই আমি এক বোতল ব্র্যান্ডি কিনি। সন্ধ্যাবেলা বোতলটা নিয়ে বসি।' একথা শুনে আমি বললাম, 'তারপর ?'

বন্ধু বললেন, 'তারপর আর কী ? দু ঘণ্টার মধ্যেও উধাও।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'দু ঘণ্টায় সর্দি উধাও। বন্ধু হেসে বললেন, 'আরে, না না, সর্দি নয়। ব্র্যান্ডিটা উধাও। সর্দির কথার সূত্রে স্বাস্থ্যের কথা একটু বলি। 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' কথাটা বাংলাভাষায় চমৎকার চলে গেছে। কিন্তু আসল কথাটা ইংরেজি।

হাই ইংলিশ স্কুলের অন্তত ক্লাস সেভেন পর্যন্ত সে যুগে যারা পড়েছে, তারা সবাই জানে আসল ইংরেজি বাক্যটি। কত বাক্যরচনা করতে হয়েছে, অ্যামপ্লিফাই (Amplify)। এমনকি সম্পূর্ণ রচনার বিষয়বস্তু ছিল 'Health is wealth' অর্থাৎ 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'।

স্বাস্থ্যই সম্পদ এই আপ্তবাক্যটি নিয়ে বিশেষ ব্যঞ্জনায় একটি রসিকতা আছে।

রসিকতাটি হল, সম্পদশালী এবং সম্পদহীন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা একরকম নয়, আলাদা।

সম্পদহীন একজন গরিবমানুষ শীতের সকালে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগাল। তারপর গলা ব্যথা, চোখ লাল, গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা, গায়ে

বেশ জ্বর। গেল পাড়ার ডাক্তারের কাছে। সব দেখে-শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, 'ও কিছু নয়, একটু সর্দি-জ্বর হয়েছে। এরকম হচ্ছে আজকাল। ওষুধপত্র লাগবে না। একটু নুন-জল দিয়ে গার্গল করবেন।

সম্পদশালী একজন বিত্তবান মানুষ বড়দিনের সকালে বাহাদুরি করে ক্লাবে গলফ খেলতে গিয়ে শীতের বৃষ্টিতে ভিজলেন। তারপরে ওই একই উপসর্গ গলা ব্যথা, চোখ লাল, গাঁটে যন্ত্রণা, গায়ে জ্বর। তিনি গেলেন উডভিউ নার্সিংহোমে ডাক্তারসাহেবের কাছে। ডাক্তারসাহেব তাঁর আপাদমস্তক স্ক্যান করে মল মূত্র কফ পরীক্ষা করিয়ে অবশেষে রায় দিলেন অ্যাকিউট ল্যারিনজাইটিস। সাতদিন চিকিৎসা, পনেরো দিন বেডরেস্ট। এই কারণেই লোকে বলে যে সর্দি-জ্বর চিকিৎসা করালে সাত দিনে সারে, চিকিৎসা না করালে লাগে এক সপ্তাহ।

পুনশ্চ : সব অসুখই যে ডাক্তারবাবুরা সারাতে পারেন, তা কিন্তু নয়। রাতে খেয়ে ওঠার পর এক ভদ্রলোকের ঘনঘন হিক্কা উঠছিল। ছেলে ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিল, মা তাকে থামালেন, বললেন, 'ডাক্তার লাগবে না। বাবাকে এ মাসের ইলেকট্রিক বিলটা দেখাও, এক্ষুনি হিক্কা বন্ধ হয়ে যাবে।'

বই চুরি

বারবার নানা জায়গায় নানা বিষয়ে লিখছি। এবার একটু নিজের ব্যাপারে লিখলে সেটা বোধ হয় খুব দোষের হবে না।

ব্যাপারটা অবশ্য মজার নয়, বরং দুঃখের ঘটনাই বলা যেতে পারে।

প্রকাশক মহোদয়ের কাছে শুনলাম এবারের বইমেলায় সর্বপ্রথম যে বইটা চুরি গিয়েছিল সেই বইটা আমার। বলা বাহুল্য, চুরিটা ধরা পড়েছিল, তাই জামা গিয়েছিল।

সামান্য সাদামাটা ছেলেমানুষি হাসিঠাট্টার একটার বই 'জলভাত'। সেই বইটা চুরি করার আগ্রহ হতে পারে, ভেবে খুব অবাক লাগল।

এই সূত্রে অল্প কিছুদিন আগের অন্য একটা বই চুরির ঘটনা মনে

পড়ছে। ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক এবং বেদনারই। খবরের কাগজে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছিল এবং পরে এ-বিষয়ে সম্পাদকীয় পর্যন্ত লেখা হয়েছিল।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে একটি মূল্যবান গ্রন্থ চুরি করে বইটিকে লুকিয়ে বেরিয়ে আসার পথে এক ভদ্রলোক ধরা পড়েন। উৎসাহী কর্মকর্তারা ওই ভদ্রলোককে পুলিশে দেন।

খবরের কাগজের অনবধানতাবশত ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা কাগজে ছাপা হয়। তাঁর পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে। এর পর পুলিশ ওই ব্যক্তির বাড়ি তল্লাসি করে আরও অনেক বই পায়, যেগুলো জাতীয় গ্রন্থাগার সমেত আরও কোনও কোনও লাইব্রেরি থেকে চুরি করে সংগৃহীত।

তবে এর মধ্যে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যায় এই তস্কর ভদ্রলোকটি সামান্য চোর নন। ইনি বই বিক্রি করার জন্য চুরি করতেন না। ইনি ছিলেন প্রকৃত পুস্তকপ্রেমিক। মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করাই নেশা, চুরি করাটা পেশা নয়।

খবরের কাগজে তখন সংবাদদের অভাব চলছিল। তাই এই বই চুরি ধরা পড়ার ব্যাপারটা গুরুত্ব পায় এবং বেশ কয়েকদিন ধরে লেখালেখি চলে।

ইতিমধ্যে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। কাগজ জানাজানি হয়ে যাওয়ায় অপমানের জ্বালায় ওই তস্কর ভদ্রলোক আত্মহত্যা করলেন। কাহিনীর যবনিকা পতন হল, বিয়োগান্ত নাটকের আদলে। এবং তখনই পুলিশ-প্রশাসন-খবরের কাগজ বুঝতে পারল ব্যাপারটা এই বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

বইচুরির ঘটনাকে কখনওই খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এমন কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি কি আছেন যিনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে তাঁর বাড়িতে সমস্ত বইই তাঁর নিজের? নিজের বই যেগুলো নয় সেগুলো যে তিনি চুরি করে, লুকিয়ে কোথাও থেকে নিয়ে এসেছেন ত হয়তো নয় কিন্তু একথা সত্যি যে তিনি ধার করে পড়তে এনে ফেরত দেননি এবং সেও এক্ষেত্রে চুরিরই নামান্তর।

সেই পুরনো গল্পটা তো সবারই জানা আছে। গল্পটা কখনও বার্নার্ড শ, কখনও হরিনাথ দে, কখনও বা অন্য কোনও খ্যাতনামা পণ্ডিতকে নিয়ে বলা হয়।

সেই পণ্ডিতমহোদয়ের বাড়িতে অজস্র বই, ঘরে বারান্দায় সিঁড়িতে মেজের ওপরে ডাঁই করে রাখা। তাই দেখে এক শুভানুধ্যায়ী

বলেছিলেন, 'আপনার এত বই সব এত অযত্নে রেখেছেন, দুয়েকটা আলমারি বা সেলফ তো রাখতে পারেন।' পণ্ডিত এবার হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'ভাই, বইগুলো যে ভাবে সংগ্রহ করেছি, আলমারি বা তাক তো সে ভাবে সংগ্রহ করা যাবে না।'

এবার আসল কথায় যাই। সে কথাটা হল আমার বইটা চুরি হওয়া নিয়ে।

এত বড় একটা বইমেলায় এত বইয়ের দোকানের এত হাজার হাজার বইয়ের মধ্যে এই তস্কর ভদ্রলোক হঠাৎ আমার মত অভাজনের একটি নগণ্য গ্রন্থ চুরি করতে গেলেন কেন ?

প্রথমে এই ভেবে মনে মনে গৌরব বোধ করলাম যে পাঠকদের কাছে আমার লেখা বইয়ের আকর্ষণ এতই দুর্বার যে জনৈক পাঠক ন্যায়নীতির সমস্ত সংস্কার ও দ্বিধা ভেঙে আমার বইটি চুরি করেছেন, নিতান্তই মানসিক তাগিদে তিনি এই কাজটি করেছেন।

কিন্তু এর পরেই মনে হল, হয়তো আমার বইয়ের চাহিদা নেই, একেবারে বিক্রি হয় না, তাই প্রকাশকমহোদয় আমার বইগুলো দোকানের কোনও এক অপরিচিত অবহেলিত প্রান্তে ঢেলে রেখেছিলেন, সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা সহজ ভেবে ওই ভদ্রলোক বইটি তুলে নেন এবং দুর্ভাগ্যবশত ধরা পড়েন।

এই রকম খারাপভালো যখন দ্রুত চিন্তা করছি প্রকাশকমহোদয় জানালেন, 'সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে লোকটা ধরা পড়ায় পকেট থেকে টাকা বার করে আপনার বইটা কিনে নিয়ে চলে গেল।'

আমিও খুব আশ্চর্য হলাম এবং এই ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে আমার বইটা অন্তত এককপি বিক্রি হয়েছে।

কৃপণ

'কিপ্‌টের যাশু' বলে একটা প্রচলিত কথা আছে! কখনও কখনও বেশি হিসেবি লোককে বলা হয় 'কিপটের যাশু', মানে মহাকৃপণ। এরকম লোক আমরা সবাই অল্পবিস্তর দেখেছি, আমাদের চারপাশেই এরা আছে।

আমার পরিচিত এক ব্যক্তিকে জানি যিনি দাড়ি কমিয়ে, স্নান করে

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার আগে দাড়ি কামানোর সাবান মাখা বুরুশটা ধুয়ে রাখেন না। না, এটা কোনও মনের ভুলে নয়। ইনি এটা সজ্ঞানেই করেন। এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম হিসেব আছে। তিনি ওই সাবান-সিক্ত বুরুশটা ধোয়ার কাজ করেন ভাত খেয়ে আঁচানোর পরে। কারণ আর কিছুই নয়, এতে খাওয়ার পরে হাত ধোয়ার জন্যে আলাদা করে সাবান লাগে না, দাড়ি কামানোর উদ্বৃত্ত সাবান যেটুকু বুরুশে লেগে থাকে তাতেই মোটামুটি হয়ে যায়। সৈয়দ মুজতবা আলীর সেই বহুবিখ্যাত কৃপণ বড়বাবুর গল্প তো সবাই জানেন, কিন্তু নিজেও একবার লিখেছিলাম। সম্প্রতি পুনরায় বাসা বদলের সময় বইপত্র সব এলোমেলো হয়ে গিয়েছে, বইটা হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছি না। তবু গল্পটা আর একবার নিজের মত করে বলতে দোষ কি ?

এক অফিসের বড়সাহেব ভীষণ খরুচে। প্রত্যেক মাসেই পনেরো দিন যেতে না যেতে তঁর টাকার টানাটানি শুরু হয়। এই অফিসেরই বড়বাবু বড়সাহেবের তিনভাগের এক ভাগ মাইনে পান, সেই বড়বাবুর কাছ থেকে প্রতি মাসেই বড়সাহেব টাকা ধার করেন আর ভাবেন, 'আমি এত টাকা উপার্জন করেই চালাতে পারি না, আর আমার বড়বাবু আমার তিনভাগের একভাগ মাইনে পায়, সে সংসার চালিয়ে টাকা ধার দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পায় ?'

এই প্রশ্নের উত্তর বড়সাহেব কিছুদিনের মধ্যেই পেয়ে গেলেন। সেদিন ছিল মাসের শেষদিকের একটা ছুটির দিন। বড়সাহেবের খুব টাকার টানাটানি। অন্যান্যবার অফিসেই টাকাটা চেয়ে নেন কিন্তু এবার ছুটির দিন বলে বড়বাবুর বাড়িতে যেতে হল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বেশ অন্ধকার। বড়বাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখলেন কোথাও কোনও আলো-টালো জ্বলছে না। দু-একবার কড়া নাড়তে বাইরের ঘরে একটা টিমটিমে আলো জ্বলে উঠল। বড়বাবু নিজেই দরজা খুললেন। খালি গা, পরনে গামছা। বড়সাহেব তাঁর প্রয়োজন জানাতেই বড়বাবু বাড়ির ভেতরে গিয়ে টাকাটা এনে দিলেন। টাকাটা পাওয়ামাত্র চলে যেতে বড়সাহেবের কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল, তিনি বড়বাবুর সঙ্গে একথা-ওকথা বলতে লাগলেন। তখন বড়বাবু বিনীতভাবে বললেন, 'হুজুর কি একটু থাকবেন ?' অপ্রস্তুত হয়ে বড়সাহেব বললেন, 'না। না। এই একটু গল্প করছিলাম আপনার সঙ্গে। আপনার কোনও অসুবিধে আছে ?' বড়বাবু বললেন, 'না হুজুর, অসুবিধের কথা নয়, আপনি যদি থাকেনই, তা হলে আলোটা নিভিয়ে দিই আর আমার গামছাটা খুলে ফেলি, শুধু শুধু অপব্যয় কবি

কেন ?

বড়সাহেব সেদিন অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন তঁর অধীনস্থ বড়বাবুর টাকা জমে কী করে ? অল্প কিছুদিন আগে এই 'শেষমেশেই' শনিবারের চিঠির আলোচনায় স্কটল্যান্ডিয়দের ট্রামভাড়া কমানোয় ক্ষোভের কথা লিখেছিলাম। আসলে তারা হেঁটে দু-আনা বাঁচাত, এখন ভাড়া কমে যাওয়ায় দেড় আনা বাঁচাচ্ছে। স্কটল্যান্ডিয়দের কৃপণতা নিয়ে হাজারো গল্প। তার কোনও কোনওটা রীতিমত গোলমেলে।

প্রথম গল্পটি ধরা যাক। এক স্কটিশ দম্পতি তাদের নতুন বাড়ি ঘুরে ঘুরে বন্ধুদের দেখাচ্ছে। বাড়ির শেষপ্রান্তের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এবার আমরা আমাদের গানবাজনা শোনার ঘরে এলাম।' এ কথা শুনে সবাই ধরে নিয়েছিল নিশ্চয় ঘরে পিয়ানো বা অর্গান আছে, কিংবা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। রেডিওগ্রাম, ক্যাসেট প্লেয়ার। কিন্তু তা নয়, ফাঁকা ঘরে জানালার পাশে দুটো চেয়ার—তা ছাড়া আর কিছু নেই। বন্ধুরা এই প্রসঙ্গে সপ্রশ্ন হয়ে উঠলে স্কটিশ দম্পতি বোঝালেন যে, পাশের বাড়িতে রেডিও আছে। এই জানালার পাশে চেয়ারটায় বসলে সেটা স্পষ্ট শোনা যায়।

আর একবার এই স্কট ভদ্রলোক তাঁর ছেলে রাতে দেরি করে বাসায় ফেরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রাত হল কেন ?' ছেলেটি জবাব ছিল, 'বান্ধবীর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।' এই কথা শুনে পিতৃদেব কপালে করাঘাত করলেন, 'তা হলে তো সর্বনাশ হয়েছে। নিশ্চয় অনেক টাকা খরচ হয়েছে।' ছেলে বলল, 'না, মাত্র দশ টাকা খরচ হয়েছে।' এ কথায় পিতৃদেব আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'তা ভাল্। কিন্তু মাত্র দশ টাকায় এক সন্ধ্যা, আজকালকার বাজারে তো দুটো সিনেমার টিকিটই দশ টাকায় হয় না।' ছেলে বলল, 'আমিও তো আমার বান্ধবীকে তাই বললুম, কিন্তু কী করব ওর কাছে দশ টাকার বেশি ছিল না।'

এই কৃপণচর্চা শেষ করি এক স্কটল্যান্ডিয় ভদ্রলোকের অমর উক্তি দিয়ে। তিনি লন্ডনের এক রেস্তেরাঁতে একটি টেবিলে আমার সামনে বসেছিলেন। এক পেয়ালা চা নিয়ে পরপর চার চামচে চিনি মেশালেন তাতে। তারপর আমাকে দুঃখ করে বললেন, 'কোনওদিন ঠিকমত চিনি দিয়ে চা খাওয়া হল না আমার। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন ?' তিনি বললেন, 'বাসায় আমি এক পেয়ালা চায়ে এক

চামচ চিনি খাই। বাইরে খাই চার চামচ। কিন্তু দুঃখে কথা কী জানেন আসলে আমার দু-চামচ চিনি হলে ঠিক হয়।'

ফিলমি

হাওড়া স্টেশন দিয়ে শান্তিনিকেতন যাচ্ছিলাম। যথারীতি ট্রেনে বিভ্রাট। কোথায় লেভেল ক্রশিংয়ে জি টি রোডের ওপরে একটা বালির লরি মুখ থুবড়িয়ে পড়ে আছে রেল লাইনের ওপরে। ট্রেন কখন আসবে তার কিছু ঠিক নেই। দেড়-দু ঘণ্টা দেরি তো হবেই।

প্ল্যাটফর্মে ইতস্তত পায়চারি করতে করতে প্রায় অন্যমনস্কভাবেই ম্যাগাজিন স্টলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। চেনাশোনা কিছু পত্র-পত্রিকা, কয়েকটি আধা-অশ্লীল ইংরেজি-বাংলা-হিন্দি এবং বোধহয় ওড়িয়া সাময়িক পত্র, হিন্দি পেপারব্যাক, পঞ্জিকা, টাইমটেবল এবং অবশেষে সেই লোভনীয় সব ইংরেজি পেপারব্যাক খারাপ-ভাল চটুল—ক্লাসিক হেমিংওয়ে, মারকুইজ থেকে এলেরি কুইন, জাভিয়েরা হলান্ডার।

পারতপক্ষে এ-সব বই আজকাল আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করি না, আঙুলে ঢোসকা পড়ে যায়। যে কোনও চটি পেপারব্যাকের দাম চার ডলার নিরানব্বুই সেন্ট কিংবা তিন পাউন্ড ঊনপঞ্চাশ শিলিং। মুদ্রামূল্য ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান যাই হোক না কেন, ভারতীয় টাকায় অন্তত দেড়শ টাকা। আরও গোলমেলে ব্যাপার হল, দোকানি জানেন দেড়শ টাকায় কেউ কিনবে না, তাই তিনি আশি-নব্বুই টাকার মধ্যে দামটা চান। ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা বড় গোলমাল আছে।

তা থাক। আমি এত দামি বই কদাচিৎ কিনি। তার একটা কারণ অবশ্য এই যে, প্রায় কোনও সময়েই পকেটে এত টাকা থাকে না।

এবার কিন্তু বুকস্টলে গিয়ে দেখলাম খুবই সস্তার সব পুস্তিকা বেরিয়েছে, পকেট গীতার সাইজের ইংরেজি রঙিন পেপারব্যাক, দাম মাত্র পাঁচ টাকা। সবই হালকা, খুচরো বই। নিতান্ত রঙ্গ-তামাসার চুটকি, যার অধিকাংশই বহুপঠিত। বহুশ্রুত।

আমি একটি বই কিনলাম যার নাম 'ফিলমি জোক'। মলাটে দুই

জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকার রঙিন, চটুল ছবি।

ট্রেন আসবার আগে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বইটার পাতায় চোখ ওলটানো শেষ হল। দুয়েকটা যেন নতুন রসিকতা চোখে পড়ল।

একটা গল্পে দেখছি চিত্র পরিচালক বিখ্যাত নায়ককে বলছেন, 'তোমার জামার বোতামটা ছেঁড়া।'

নায়ক বললেন, 'জানি।'

পরিচালক বললেন, 'জামার বোতামটা লাগিয়ে নাও।'

নায়ক বললেন, 'সম্ভব নয়, কারণ আমার স্ত্রীও জানেন যে বোতামটা ছেঁড়া।'

বিমূঢ় পরিচালক বললেন, 'তার মানে ?'

নায়ক বললেন, 'মানে খুব সোজা। আমার স্ত্রী এটাও জানেন যে এই কাহিনীর নায়িকা সূচিকর্মনিপুণা। তিনি যদি দেখেন জামায় বোতামটা লাগানো হয়েছে শুধু বোতাম নয়, বাড়ি ফিরলে তিনি পুরো জামাটাই ছিঁড়ে ফেলবেন।'

অন্য একটা গোলমেলে গল্প নায়ক-নায়িকার বিসম্বাদ নিয়ে। নায়িকা পরিচালককে বললেন, 'আমি অমুক নায়কের সঙ্গে একত্রে অভিনয় করব না।' বই অর্ধেক হয়ে গেছে। পরিচালকের মাথায় হাত, তিনি করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন কী হয়েছে ? অমুক কী করেছে ?'

নায়িকা বললেন, 'অমুক আমাকে অপমান করেছে।'

পরিচালক বললেন, 'কী অপমান !'

নায়িকা জবাব দিলেন, 'অমুক আমাকে প্রশ্ন করেছে আমি গান গাইতে জানি কি না ?'

পরিচালক বললেন, 'এটা আর কী অপমান হল ? অমুক হয়তো সত্যিই জানে না যে আপনি গান জানেন।'

নায়িকা এবার কেঁদে ফেললেন, তারপর ধরা গলায় বললেন, 'না তা নয়। আমি যখন গান গাইছিলাম, তখনই অমুক আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি গান গাইতে জানি কিনা ?'

পরের গল্পটি নিতান্ত ছারপোকা নিয়ে।

এক নায়ক এক হোটেলে গেছেন। সেখানে যখন হোটেলের রেজিস্টারে সই করতে গেছেন দেখেন যে একটি গোলগাল বড়সড় ছারপোকা সেই খাতার ওপরে ঘুরছে। ছারপোকাটিকে দেখে খাতায় সই না করে নায়ক হোটেলের ম্যানেজারকে বললেন, 'আপনাদের

ছারপোকা দেখছি খুবই শিক্ষিত। আমি সই করার আগেই রেজিস্টারে দেখতে এসেছে আমি কোন্ ঘরে উঠছি না। না মশায়, আমি আপনাদের এখানে উঠছি না। ছারপোকার কামড় আমার একেবারে সহ্য হয় না।' এই বলে নায়ক জিনিসপত্র নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এর পর রন্ধনপটিয়সী নায়িকার গল্প। একদা মধ্যরাতে তিনি স্বামীর ঘুম ভাঙিয়ে বলেছিলেন, 'ওগো, কিসের যেন শব্দ হচ্ছে। রান্নাঘরে বোধহয় চোর ঢুকেছে।'

ভুক্তভোগী স্বামী বলেছিলেন, তাই কি ?'

নায়িকা বললেন, 'চোরটা আমার এত কষ্ট করে তৈরি করা কেকটা খেয়ে নিল। তুমি চট করে থানায় একটা ফোন করো।'

নির্বিকার স্বামী বললেন, 'থানায় ফোন করে কী হবে ? পুলিশ কী করবে ? বেচারা যদি কেকটা খেয়েই থাকে, আমি বরং ডাক্তারকে ফোন করি।'

পুনশ্চ : অবশেষে সেই সুন্দরীতমা, মোহিনী নায়িকা। তাঁর একটি স্মরণীয় মন্তব্য : 'লোকে কেন যে এই জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে মাথা ঘামায় আমি ছাই বুঝি না। আরে যত মানুষ জন্মাবে, সব মানুষই তো মারা যাবে। তা হলে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন ?'

ফিলমি-ফিলমি

শুধু একবার ফিলমিতে হল না। তাই আরেকবার, তাই ফিলমি-ফিলমি।

বলে রাখা ভাল 'ফিলমি' শব্দটি মোটেই সুবিধের নয়। বাংলা তো নয়ই, না হিন্দি না ইংরেজি, বোম্বাই ঘরানার শব্দ। তদুপরি ফিলমি-ফিলমি শব্দযুগ্ম আরও গোলমেলে হয়ে গেল।

কিন্তু 'ফেলমি-জোকস' নামে এই চটি বইখানিতে রয়েছে বেশ ভাল কিছু উপাখ্যান। এর মধ্যে অবশ্যই কিছু আদিরসাত্মক যা আমার রুচিতে বাধে। বাকি কিছুর সঙ্গে বিখ্যাত নায়ক-নায়িকাদের নামধাম জড়িত, সেটাও এড়িয়ে যেতে হবে। সুতরাং মোটামুটি পরিবেশনযোগ্য দু-চারটি আখ্যান বেছে নিতে হচ্ছে।

যেমন এই প্রথম গল্পটা। এক নায়িকার স্বামী মারা গেছেন বা আত্মহত্যা করেছেন। নায়িকা যথেষ্ট ভালবেসেই বিয়ে করেছিলেন এই লোকটিকে। সরলচিত্ত, আবেগময়, ধনবান যুবক, পাত্র হিসেবে মোটেই খারাপ নয়।

কিন্তু যেমন হয়। নায়িকার কর্মব্যস্ত, মোহময়ী বহুমুখী জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলেন না এই যুবকটি। একদিন তিনি আত্মহত্যা করলেন।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই নায়িকার খুবই বিরক্ত লাগছিল তাঁর বরকে। কেমন চাকচিক্য ও জৌলুসহীন, সাদামাটা, তার ওপরে ঘ্যানঘেনে স্বভাবের। সব সময়ে জানতে চাইছে, কোথায় গিয়েছিলে, কে ফোন করেছিল, এত দেরি হল কেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি সব বাজে প্রশ্ন।

কিন্তু আজ বরের মৃত্যুর পরে এই সরল লোকটির জন্যে নায়িকার খুব মায়া হল। অনেক অবহেলা, উপহাস করেছেন নায়িকা তাঁর বরকে। এখন কেমন যেন মনে হল এতটা উপেক্ষা না করলেও পারতেন। নায়িকার খুবই কান্না পেল। নির্জন ঘরে দরজা বন্ধ করে পুলিশ ও খবরের কাগজের রিপোর্টারের হাত এড়িয়ে বহুকাল পরে আজ নায়িকা প্রাণ খুলে কাঁদবেন।

কিন্তু দুঃখের কথা নায়িকার চোখ দিয়ে একফোঁটা জল বেরোল না। অনেকক্ষণ, অনেক চেষ্টা করার পর তিনি আবিষ্কার করলেন তিনি কাঁদতে ভুলে গেছেন, গ্লিসারিন ছাড়া তাঁর চোখে আর কোনওদিন জল আসবে না। শত দুঃখে, শত শোকেও না।

এতবড় একটা করুণ কাহিনীর পরে এবার একটা সত্যিকারের হাসির গল্প বলা যাক। গল্পটা খুবই পরিচ্ছন্ন। পত্র-পাত্রীর নাম ব্যবহারে অসুবিধে নেই। সবাই জানেন যে হিন্দি সিনেমার প্রসিদ্ধতম নায়ক শ্রীযুক্ত অমিতাভ বচ্চন খুবই লম্বা, যাকে সাদা বাংলায় ঢ্যাঙা বলে।

একবার চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যের শ্যুটিংয়ের সময় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কিছু ভুলত্রুটি হওয়ার পর কয়েকবার চিত্রগ্রহণ করতে হয় এবং তার ফলে আরও দেরি হয়।

বরফের ওপর খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা কম কথা নয়। কিন্তু বোম্বাই চলচ্চিত্রের নায়কদের নাকি এ রকম বহু কষ্টই করতে হয়। সে যা হোক, চলচ্চিত্রের এই শ্যুটিংয়ে অমিতাভ বচ্চনের সামনেই ছিলেন অতীতের দিকপাল খল-নায়িকা। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে

সুরসিকা নাদিরা, যিনি এই কাহিনীর পার্শ্বচরিত্রে একজন অভিনেত্রী।

শ্রীযুক্ত বচ্চনকে বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শ্রীমতী নাদিরা বললেন, 'বরফের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে তো তোমার সর্দি লেগে যাবে। তবে তোমার একট বড় সুবিধে রয়েছে। তুমি এত ঢ্যাঙা যে পা থেকে তোমার নাক পর্যন্ত ঠাণ্ডা পৌঁছতে বেশ কয়েকদিন লাগবে। তার আগেই ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ-টষুধ খেয়ে নিও।' পরের আখ্যানটি একালের দুই নায়ক-নায়িকা নিয়ে। গল্পটি নিতান্ত নির্বিষ এবং নিরামিষ বটে। নামধাম গোপন না করেই বলি। অবশ্য নামধাম গোপন করার তেমন কোনও প্রশ্ন নেই। এ গল্প একদা দিলীপকুমার ও সায়রা বানুর নামে, পরে বেশ কয়েকজোড়া দম্পতি পার হয়ে এখন এসে ঠেকেছে নতুন যুগের তারকাদম্পতি হিমালয় ও ভাগ্যশ্রীর নামে।

বিয়ের কিছুকাল পরে শ্রীমতী ভাগ্যশ্রী নাকি একদিন অনুযোগ করে যে, 'ওগো তুমি বিয়ের আগে আমাকে কত কী উপহার দিতে, কিন্তু এখন আর দাও না কেন?'

সুন্দরী চিত্রতারকা স্ত্রীর এই প্রশ্ন শুনে নির্বিকার হিমালয় উত্তর দিয়েছিল, 'আমি আর কেন উপহার দিতে যাব তোমাকে? মাছ বঁড়শিতে গাঁথা হয়ে যাওয়ার পর কেউ কী আর সেই মাছকে টোপ খাওয়াতে যায়।'

এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল অন্য এক তারকা দম্পতির ক্ষেত্রে। এদের কিন্তু পরিচয় দেওয়া যাবে না। স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার কি মনে হয় না, অনেক ভাল হত তুমি না হয়ে অন্য কেউ যদি আমাকে বিয়ে করত?'

স্বামী হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'না, এ রকম আমার মনে হয় না। আমি কারও খারাপ চাই না।'

পুনশ্চ :

একটি চিত্রনটিকা।

সুন্দরী তরুণী অভিনেত্রী প্রবীণ নায়ককে বললেন : আমার সবচেয়ে ভাল লাগে আপনার ওই ঝকঝকে দাঁতের হাসি। প্রবীণ নায়ক মুখ থেকে বাঁধানো দাঁতজোড়া খুলে বললেন : এই নাও, তোমাকে এটা উপহার দিলাম।

চার্চিল

এই ধুরন্ধর রাজনীতিবিদের জন্ম, মৃত্যু বা অভিষেকের শতবার্ষিকী, রজত বা হীরকজয়ন্তী কিছু নয়। বড় জোর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসপঞ্জী খুলে বলা যেতে পারে, মিত্রপক্ষের অন্যতম প্রধান স্থপতি, চার্চিলের প্রত যুদ্ধলক্ষ্মী প্রসন্ন হওয়ার এটা সুবর্ণজয়ন্তী বৎসর।

আশ্চর্য কাণ্ড ! স্মৃতি-বিস্মৃতির গলিঘুঁজিগুলি বড় আলোছায়া-ঘেরা, বড়ই রহস্যময়।

বঙ্গীয় সংবাদ-বিদ্যার মহাগুরু বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে মনে পড়ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা, আর সেই সূত্রে উইনস্টন চার্চিল।

চার্চিল মানে স্যার উইনস্টন লিওনার্ড স্পেন্সার চার্চিল। আমাদের অল্প বয়েসে, চার্চিল সাহেব তখন মধ্যগগনের সূর্য, একটি ছেঁদো রসিকতা ছিল তাঁর নাম নিয়ে। এটি একটি ধাঁধামূলক রসিকতা। প্রশ্ন করা হত, বলো তে চার্চিলের কয় পা ? চার্চিল মানে চারটি চিলপাখি হলে উত্তর হল : পায়ের সংখ্যা চার দু' গুণে আট। আবার চার্চিল যদি গোটা মানুষ হন, যে-ব্যক্তি বিলেতের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর তো দুটো পা। জানি না এই রসিকতা তর্জমা করে চার্চিল সাহেবের কাছে পৌঁছেছিল কি না ! নিশ্চয়ই পৌঁছয়নি। কোনও বঙ্গভাষী তাঁর কাছাকাছি ছিলেন বলে শুনিনি। তা ছাড়া এই নাক-উঁচু, নীল-রক্ত ইংরেজের সঙ্গে আমাদের ছিল রাজা-প্রজা সম্পর্ক ; তিনিই তো ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পাততাড়ি গোটানোর অনুষ্ঠানে আমি সভাপতিত্ব করতে চাই না।' সে-সব যাই হোক, এতদিন পরে আর রাগ পুষে লাভ নেই। তা ছাড়া উইনস্টন চার্চিলের কাছে আজকের সভ্য পৃথিবীর একটা বড় ঋণ রয়েছে, ফ্যাসিদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অক্লান্ত যোদ্ধা।

চার্চিল ছিলেন সুরসিক, তর্কবীর। তাঁর বিখ্যাত উক্তিগুলি বাদ দিয়ে দুয়েকটি কম-পরিচিত রসিকতার উল্লেখ করা যেতে পারে।

একদা বিরোধীপক্ষের এক মহিলা এম পি চার্চিলকে বলেছিলেন, 'মিঃ চার্চিল, আপনার ওই খোঁচা গোঁফ আর ওঁছা যুক্তি—এ-দুটোর কোনওটাই আমার পছন্দ নয়।'

তিক্ত হাসি হেসে চার্চিল বলেছিলেন, 'এ-দুটোর কোনওটার সংস্পর্শেই আসার সুযোগ আপনার হবে না, মহোদয়া, আপনি নিশ্চিন্ত

থাকুন।'

এই হল চার্চিলের বিরোধীর সঙ্গে বাক্যালাপ। অনুগামীর সঙ্গে কথাও কম চিত্তগ্রাহী নয়। একদিন এক অনুগামী উচ্ছ্বাসভরে চার্চিলকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা স্যার, এই-যে এত লোক সব সময়ে আপনার বক্তৃতা শুনতে ভিড় করে আসে, এতে আপনি গৌরব বোধ করেন না ? এতে আপনার রোমাঞ্চ হয় না ?'

চার্চিল জবাব দিয়েছিলেন, 'গৌরব বোধ করি বই-কি। রোমাঞ্চ হয় বই-কি। কিন্তু তুমি একবার ভেবে দ্যাখো তো যে যদি আমার বক্তৃতার বদলে আমাকে আজ ফাঁসি দেওয়া হত, তা হলে লোক আরও কত বেশি হত।'

চার্চিলের অন্য একটি কাহিনী, সেই যাকে বলে সেয়ানে-সেয়ানে। জর্জ বার্নার্ড শ. বনাম উইনস্টন চার্চিল। বলা বাহুল্য, এঁরা দু'জন সমসাময়িক। তখন বার্নার্ড শ-এর বিখ্যাত নাটক 'পিগম্যালিয়ন' লন্ডনের মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। অভিনয়ের প্রথম দিনের শো-এর দুটি পাশ চার্চিলকে পাঠিয়ে দিয়ে বার্নার্ড শ চার্চিলকে লিখেছিলেন, 'একটি পাশ আপনার জন্যে আর দ্বিতীয়টি আপনার কোনও বন্ধুর জন্যে, অবশ্য যদি আপনার কোনও বন্ধু থাকে।' এর উত্তরে পাশ দুটি ফেরত পাঠিয়ে চার্চিল জানালেন, 'দুঃখিত, আমি আজ যেতে পারছি না। তবে কাল আপনার শো-তে যেতে পারি। অবশ্য কাল কিংবা আর-কখনও যদি আপনার শো হয়।'

এর চেয়েও তির্যক মন্তব্য চার্চিলের রাজনীতি বিষয়ে। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, ভাল রাজনীতিবিদের যোগ্যতা কী হওয়া উচিত। চার্চিল বলেছিলেন, 'বিশেষ কিছু নয়। শুধু তাকে দূরদর্শী হতে হবে ; সে যেন ভবিষ্যতে কী ঘটবে সেটা ঠিকমতো বলতে পারে। আর যখন সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিলবে না, তখন যেন ব্যাখ্যা দিতে পারে, কেন মিলল না।' এবার চার্চিল সম্পর্কে একটি পরিচিত গল্প বলি। চার্চিলের আশি বছরের জন্মদিনে এক তরুণ ফটোগ্রাফার তাঁর ফটো তুলতে গিয়েছিল। সে মাতব্বরি করে বলেছিল, 'আমি আশা করি আপনার জন্মশতবর্ষেও এসে এমনিভাবে ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারব।" তরুণ ফটোগ্রাফারের উৎসাহে এক কলসি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে চার্চিল তার পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, 'কেন নয় ছোকরা ? তোমার স্বাস্থ্য তো বেশ ভালই দেখছি। নিশ্চয়ই ততদিন বেঁচে থাকবে।'

পুনশ্চ : অবশেষে চার্চিল-সূত্রে একটি অ-চার্চিল গল্প।

বাংলায় যাকে ডালকুত্তা বলে, ইংরেজিতে তা-ই বুলডগ। আবার ওই থ্যাবড়া মুখের জন্যে চার্চিল-যুগে ওর নাম হয় চার্চিল ডগ। এই বুলডগ তথা চার্চিল ডগের থেকে কিঞ্চিৎ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে একটি বাচ্চা ছেলে কুকুরটিকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছিল। তাকে যখন বলা হল, 'তুমি কুকুরটকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছ কেন ?' সে নির্বিকারভাবে জবাব দিল, 'ও অনেক আগে থেকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে।'

ভয়াবহ

আর সরল সাদাসিধে নির্মল রসিকতা নয়। অতঃপর ভয়াবহ রসিকতার পালা। প্রথমেই রক্তক্ষয়ী কাহিনী।

ছোট ছেলে জয়কুমার উঠোনে খেলা করছিল। উঠোনের একপাশে ছোট একটা বাগান, সেই বাগানের পাশে একটা বড় কোদাল হেলান দিয়ে রাখা আছে।

যেমন হয়ে থাকে। জয়কুমার সেই প্রমাণ সাইজের কোদালটি নিয়ে খেলা করতে গেল এবং যথারীতি অঘটন ঘটে গেল। শ্রীমান জয়ের ডানপায়ের পাতা প্রায় দ্বিখণ্ডিত। ভয়াবহ, রক্তারক্তি কাণ্ড। সেই রক্তাক্ত পা নিয়ে শ্রীমান জয় লাংচাতে ল্যাংচাতে রক্ত ছড়াতে ছড়াতে ঘরের মধ্যে মায়ের কাছে ছুটে এল, কাঁদতে কাঁদতে ঘোষণা করল, 'মা, আমার পা আধখানা হয়ে গেছে কোদালে কেটে।'

জয়ের মা তখন মনোযোগ দিয়ে ঘরের মেঝে মুছছিলেন, মোছা শেষ করে প্রায় দরজার কাছে এসে গেছেন, পুত্রের আর্তনাদে মাথা ঘুরিয়ে দেখেন তাঁর ছেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, তার ফাঁক হয়ে যাওয়া ডান পায়ের পাতা থেকে অনর্গল রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। জয়ের মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সাবধান জয়, এইমাত্র ঘর মুছলাম, ঘরের মধ্যে ঢুকবে না, ঘরের মধ্যে যেন এক ফোঁটা রক্তও না পড়ে। রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত গেটের বাইরে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকো।'

এটি একটি নিষ্ঠুর গল্প। হাসির গল্পে কেমন যেন, কেমন যেন কেন, অবশ্যই বেমানান।

সুতরাং এবার একটি মানানসই ভয়াবহ গল্পের উল্লেখ করি। কিন্তু শুধু ভয়াবহ হলে তো চলবে না। আমার বরাতে সেটাকে সরসও

হতে হবে।

রাজীববাবুর গল্পটা বলি। রাজীববাবু মানে রাজীবলাল চৌধুরি একজন কৃতবিদ্য, খ্যাতনামা কৃপণ। তবে ওই একটাই ওঁর দোষ, কঞ্জুষপনা ছাড়া তাঁর আর কোনও গলতি নেই।

রাজীবলালের স্ত্রী মরতে বসেছেন, শাস্ত্রমতে যাকে বলা হয়ে থাকে মুমূর্ষু, মৃত্যুশয্যায়। রাজীববাবুর পত্নীঅন্ত প্রাণ, প্রতি সন্ধ্যায় মৃত্যুপথযাত্রিণীর মাথার কাছে বসে থাকেন, সারারাত জাগেন। ঘরের মধ্যে মাথার ওপরে একটা পঁচিশ পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলে। বিছানায় বেডসুইচ আছে, চোখে ঘুম গড়িয়ে এলে বেডসুইচ অফ করে স্ত্রীর বিছানার পাশে একটা ইজিচেয়ারের মধ্যে চোখ বুজে গা এলিয়ে দেন।

এইভাবে চলেছে দিনের পর দিন, বেশ কয়েক মাস। এর মধ্যে একদিন রাত দশটা নাগাদ খবর এল রাজীবলালের ভাই সজীবলাল, তিনি অন্য পাড়ায় থাকেন, বিবাদী বাগে বেসরকারি অফিসে কাজ করেন, সেই সজীবলালের একটু আগে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সজীবলাল সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফেরার পথে রাজভবনের মুখে মিনিবাস চাপা পড়েছেন। সজীবলালকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রাজীবলাল সজীবলাল পিঠেপিঠি ভাই। এই খবর পাওয়ার পর রাজীবলাল আর বসে থাকতে পারলেন না, শূন্য গৃহে মুমূর্ষু স্ত্রীকে একা ফেলে তাঁকে বেরোতেই হল, শুধু যাওয়ার সময় তিনি স্ত্রীকে বলে গেলেন, 'ওগো, শুনছ ? ওগো, সজীবের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমি একটু বেরোচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরব। কিন্তু তার আগেই তুমি যদি মরে যাও, এই বেডসুইচটা তোমার কোলের উপর রইল, তুমি মনে করে মরার আগে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যেও।'

জনৈক সরল কৃপণ লোককে ভয়াবহ রসিকতার গল্পে জড়িয়ে ফেলা আমার পক্ষে অন্যায় হয়ে গেল। আমার প্রারম্ভেই যাওয়া উচিত ছিল আদালত কক্ষে। প্রায় সমস্ত ভয়াবহ রসিকতার উৎস সেখানেই। প্রাচীন প্রথায় তীর ধনুক দিয়ে এক ভদ্রমহিলা তাঁর পতিদেবতাকে খুন করেছিলেন। খুনের মামলাটা প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পরে প্রৌঢ় জজসাহেব নিতান্ত কৌতূহলবশত মহিলাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ম্যাডাম, মামলার সাক্ষীদের মুখে যা শুনলাম, পুলিশ যা ফিরিস্তি দিল, তাতে দেখছি আপনাদের ফ্ল্যাটে বন্দুক, রিভলভার, পিস্তল, গুলি-কার্তুজ যথেষ্ট ছিল তবুও আপনি আপনার স্বামীকে ধনুক

থেকে বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে হত্যা করলেন ; কিন্তু কেন ?

প্রবীণ বিচারকের এই কৌতুহলী জিজ্ঞাসা শুনে ভদ্রমহিলা অকপটে বছিলেন, 'ধর্মাবতার, আমার তিনটি পুত্রকন্যা, তার মধ্যে দুটি শিশু, সবাই পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিল। আমি চাইনি কোনওরকম গুলিগোলার শব্দে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হোক।'

ভয়াবহ রসিকতার গল্পে একবার নরখাদকের কথাও থাকা উচিত। সংক্ষেপে বলছি। মিস্টার ক্যানিবাল উড়োজাহাজে উঠেছেন, বিমানবালিকা তাঁর হাতে একটি মুদ্রিত কাগজ ধরিয়ে দিল। মিঃ ক্যানিবাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কী'? মেমদিদি বললেন, 'আজকের খাবারের মেনু।' মিস্টার ক্যানিবাল মেনুটা মেমদিদিকে ফেরত দিয়ে বললেন, 'এটা লাগবে না। তুমি বরং আমাকে প্যাসেঞ্জার লিস্টটা দিয়ে যাও।'

অবশেষে নীতিমূলক ভয়াবহ গল্পটা বলা যেতে পারে।

তা, জর্জ ওয়াশিংটনের সেই ছেলেবেলার গল্পটা জানেন নিশ্চয়। কোদালের গল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম, এবার কুড়ুলের গল্প দিয়ে শেষ করি। জর্জ ওয়াশিংটন একদিন বালক বয়সে তাঁর বাবার বাগানের একটি মূল্যবান চেরিগাছ একটা ধারালো কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেলেন। এবং তিনি তাঁর বাবার কাছে এ ব্যাপারটা স্বীকারও করেন। জর্জের বাবা কিন্তু তাঁর শখের চেরিগাছটা কেটে ফেলার জন্যে ছেলেকে কোনও সাজা দেননি।

কিন্তু কেন ? কী কারণ ?

কারণ হল এই যে শ্রীমান জর্জের হাতে তখনও সেই ধারালো কুড়ুলটা ছিল।

পঞ্জিকা

সেই বিজ্ঞাপনটা বোধহয় আজও আছে, সেই যেখানে খুব বড় বড় আধইঞ্চি সাইজের হরফে লেখা ছিল—

'মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়'

এবং তার নীচে ছিল সবল পেশি, উন্নতবক্ষ এক তেজোদৃপ্ত পুরুষ মানুষের ছবি,

এবং তারও নীচে খুব ছোট ছোট, বোধহয় বর্জয়েস কিংবা স্মল পাইকা অক্ষরে লেখা, 'এখনও আবিষ্কার হয় নাই।'

তার মানে 'মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় এখনও আবিষ্কার হয় নাই।'

ইলেকট্রিক সলিউশনের মতো অত্যাশ্চর্য নামের, এই অমোঘ ওষুধটির বিজ্ঞাপন এই সেদিনও দেখেছি কিন্তু হাতের সামনের পঞ্জিকাটায় খুঁজে পাচ্ছি না।

যেমন খুঁজে পাচ্ছি না, সেই কবেকার জাঞ্জিবারের রাক্ষুসে লাল মুলোর সচিত্র বিজ্ঞপ্তি, যে মুলোর প্রতিটি ওজন 'ন্যূনপক্ষে' আড়াই সের।

অথবা 'ফুল আপনার ভাগ্য বলিয়া দিবে' কিংবা 'ছবির মত ঘড়ির' বিজ্ঞাপন যে ঘড়ির মূল্য মাত্র সাড়ে তিন টাকা—নতুন পঞ্জিকায় সেটাও দেখতে পাচ্ছি না।

ফুল আর ঘড়ির দুটো বিজ্ঞাপনই অবশ্য জোচ্চুরি। গোটা দশেক পরিচিত নামের ফুলের ছবির নীচে জ্যোতিষের ভাষায় ভূত ভবিষ্যৎ লেখা আছে। আপনি পোস্ট কার্ডে ফুলের নাম জানালে ভি পি ডাকে ভাগ্যফল চলে আসবে।

কিন্তু আমি একবার ধুতুরা এবং আর একবার সজনে ফুলের নাম পাঠিয়ে ভাগ্যফল পাইনি, কারণ গোলাপ বকুল জবা—এই সব সাধারণ ফুলের নামেই ভাগ্যফল তৈরি করা আছে ; অন্যরকম নামের ফুলের কোনও ভাগ্যবিচার নেই।

ঘড়ির ব্যাপারটা আরও গোলমেলে। ছবির মতো ঘড়ির জন্য টাকা পাঠালে ঘড়ি নয় তার বদলে ঘড়ির ছবি আসবে ওই সাড়ে তিন টাকার বিনিময়ে একেবারে 'ছবির মত ঘড়ি'।

পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন নিয়ে অনেক কথাই এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে। বরং পঞ্জিকার বিষয়ে কিছু বলি।

ইংরেজি নববর্ষের যেমন ক্যালেন্ডার, যার শৌখিন নাম দেয়ালপঞ্জী, বাংলা নববর্ষে তেমনই পঞ্জিকা, যদিও বাংলা দেয়ালপঞ্জীও ইংরেজি কেতায় তৈরি হয় এবং সেগুলো খুবই কাজে লাগে কারণ তাতে বার, তারিখ, ছুটির দিন ছাড়াও পূর্ণিমা অমাবস্যা, একাদশী, গ্রহণ, পুজো, পার্বণের হদিশ পাওয়া যায় এক নজরে।

অভিধানমতে পঞ্জিকা হল সেই পুস্তক যার মধ্যে তারিখ, তিথি, পর্বদিন, শুভদিন ইত্যাদি থাকে। আমরা পূর্ববঙ্গে শুদ্ধ ভাষায় পঞ্জিকা বলতাম, এখানে চলিত ভাষায় পাঁজি বলে। কাব্য বা সাহিত্য

করে পঞ্জীও অবশ্য বলা হয়, যেমন একটু আগে লিখেছি দেয়াল পঞ্জী।

আমাদের অল্প বয়সে পঞ্জিকা ছিল মোটামুটি তিন রকমের। ফুল পঞ্জিকা, হাফ পঞ্জিকা এবং পকেট পঞ্জিকা। এখনও তিন রকমই আছে তবে নামগুলো একটু বদলে গেছে। ফুল পঞ্জিকা হয়েছে ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা, হাফ পঞ্জিকা হয়েছে ফুল পঞ্জিকা আর পকেট পঞ্জিকা প্রমোশন পেয়ে হয়েছে হাফ পঞ্জিকা।

ব্যাপারটা অনেকটা মিলের ধুতি-শাড়ির মতো। একালের মধ্যবিত্ত বাড়িতে মিলের ধুতি-শাড়ি খুব একটা কেনা হয় না তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, সবচেয়ে মোটা শাড়ি হল ফাইন, আর সুপার ফাইন হল সাদামাটা। সত্যিই যেগুলো ফাইনা বা সুপার ফাইন, মিহি সুতোয় বোনা, সেগুলোর সব বাহারি নাম মহারাজা ধুতি, রাজকুমারী শাড়ি, প্রিমিয়ার 'অ্যারিস্টোক্র্যাট' ইত্যাদি।

অবশ্য এ-বিষয়ে লুঙ্গির নামকরণের কোনও তুলনা নেই। দক্ষিণ ভারত থেকে যে চমৎকার লুঙ্গিগুলো কলকাতায় আসে, যেগুলো চিৎপুরে নাখোদা মসজিদের আশপাশের দোকানে পাওয়া যায় সেগুলোর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামেই পরিচয়। বেশ ভাল লুঙ্গি হল অফিসার্স লুঙ্গি, কর্নেল লুঙ্গি। তবে সবচেয়ে ভাল, অভিজাত লুঙ্গি হল সাব ইন্সপেক্টর দারোগা লুঙ্গি। সেদিন শুনলাম বড় দারোগা লুঙ্গিও বেরিয়েছে সে আরও উচ্চমানের। সাধারণ চলনসই লুঙ্গির নাম হল রিপোর্টার লুঙ্গি।

ব্যাপারটা কথায় কথায় একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। আমার লেখার সীমাও শেষ। তবু পঞ্জিকা সম্পর্কে আরও দুয়েকটা কথা লেখার আছে।

আমাদের ছোটবেলার ছোট শহরে সবসুদ্ধ বড় পঞ্জিকা ছিল গোটা সাতেক। কালীবাড়িতে একটা, আদালতে একটা, বাজারে মহাজনি গদিতে একটা, আর কোনও কোনও সম্পন্ন গৃহস্থবাড়িতে। যতদূর মনে পড়ে, মেজর মফিজ ডাক্তারের চেম্বারেও একটা ফুল পঞ্জিকা রাখা হত।

হাফ পঞ্জিকা, পকেট পঞ্জিকা হাটে-বাজারে কাছারির বটতলাতেও বৎসরান্তে পাওয়া যেত। কিন্তু ফুল পঞ্জিকা পাওয়া যেত শুধু মাত্র একটা বাইরের দোকানে, ভারত লাইব্রেরিতে। ঠিক যে কয়টা ফুল পঞ্জিকা বিক্রি হবে গোনা-গুনতি সেই কয়টা ভারত লাইব্রেরি কলকাতা থেকে আনাত। কারণ একটা কপি বেশি হলেও নতুন বছরের পর

সেটার বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

যে বছর আমাদের পঞ্জিকা হারিয়ে যায়, সেবার দ্বিতীয় একটা পঞ্জিকা কিনতে গিয়ে বোঝা যায় যে দ্বিতীয় পঞ্জিকা সংগ্রহ করতে গেলে কলকাতা বা ঢাকা থেকে আনাতে হবে। ভারত লাইব্রেরির স্টকে আর কিছু নেই।

পঞ্জিকা হারানোর ঘটনাটা বলে শেষ করি।

আমাদের, সেই হারিয়ে যাওয়া পুরনো বাড়িতে সব কিছু হারাত। গয়নাগাঁটি, বাসনকোসন, ঘড়ি, কলম, গরু, ছাগল সব কিছু। আমরা অল্প বয়সীরা সদাসর্বদা হারিয়ে যেতাম, পুকুরঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে ঝিয়ের গেলাস হারিয়ে আসা, জ্যাঠামশাই আদালতে ছাতা হারিয়ে আসতেন, ছোট পিসিমা ব্রাহ্মমন্দিরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গিয়ে নতুন চটি হারিয়ে আসতেন।

সুতরাং পঞ্জিকা হারিয়ে যাওয়া কোনও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ঘটনাটা জটিল ও রহস্যময়। সেই জন্যেই বলা।

চৈত্র সংক্রান্তির দুয়েকদিন আগেই আদালত থেকে ফেরার পথে মুহুরিবাবু পঞ্জিকা কিনে আনতেন। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় কাছারি ঘরে লণ্ঠনের আলোতে বসে খুব ভাল করে সেটায় বাঁশকাগজ দিয়ে মলাট লাগাতেন।

এরপর নীলপুজোর দিনে সেটা যেত গাঁয়ের বাড়িতে শিবমন্দিরে, সেখান থেকে ফিরে সিঁদুর হলুদের ফোঁটা দিয়ে পরের পরের দিন পয়লা বৈশাখে সেটাকে বরণ করা হবে। তারপর থেকে সে পাঁজি থাকত পুজোর ঘরে। প্রয়োজন মতো সারা বছর ব্যবহার হত।

দুয়েকদিন পরেই অক্ষয় তৃতীয়বার লগ্নক্ষণ দেখতে দিয়ে দেখা গেল সেই বাঁশকাগজের মলাট দেয়া বইটা মোটেই নতুন পঞ্জিকা নয়, সেটা হল কাকার একটা বই কে পি বসুর অ্যালজেব্রা। কী করে সেই পঞ্জিকার সঙ্গে এই বইয়ের বদল হয়েছিল, সেই পঞ্জিকাই বা কোথায় গেল এ-সব রহস্যের সমাধান কোনওদিনই হয়নি।

স্থূল-অস্থূল

আর যারই হোক স্থূলতা নিয়ে রসিকতা করার অধিকার আমার নেই। সসপ্যানে বসানো গরম দুধের মতো টগবগিয়ে উথলে উঠছে আমার মেদ। সকালে-বিকেলে আমার ওজন বেড়ে যাচ্ছে।

সকালের কথাই আগেই বলি।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামাতে গিয়ে আমার নিজেকে ক্ষৌরকার বলে মনে হয়। আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিজেকে চিনতে পারি না ; কুতকুতে চোখ, গাল ফোলা, গোলগাল মুখ এই লোকটা, এই আমি ?

বিশ্বাস হয় না। নবীন যৌবনের ছিপছিপে, মসৃণ তারাপদকে মনে পড়ে ; কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই, দর্পণে প্রতিফলিত নির্বোধ, স্থূল লোকটির দাড়ি আমাকে কামাতেই হয়, আর তখনই নিজেকে ক্ষৌরকার মনে হয়। কারণ ক্ষৌরকার বা নাপিত ছাড়া কে আর অন্যের দাড়ি কামায় ? শুধু নিজের কাছেই ক্ষৌরকার নই। অন্যত্রও আমার পরিচয় পরিবর্তিত হয়েছে। আগে ছুটির দিনে জগুবাবুর বাজারে বাজার করতে যেতাম, তরকারির এলাকাতেই হাঁকডাক বেশি, সেখানে গেলে আগে 'আসুন বাবু', 'আসুন দাদা' ইত্যাদি আহ্বান শুনতাম। আজকাল সেই দোকানদারেরাই আমাকে 'আইয়ে শেঠজি, আইয়ে শেঠজি' বলে ডাকেন। নিশ্চয় আমার সুদূরপ্রসারী ভুঁড়ির প্রতি সৌজন্যবশত তাঁদের এই ভ্রম।

দূরদর্শনের একটি বিজ্ঞাপন আজকাল আমাকে খুবই আলোড়িত করে :

'ওই বাড়ন্ত বাচ্চার জামা চটপট ছোট হয়'...শুধু জামা নয়, কোট-প্যান্ট, পাজামা-পাঞ্জাবি, এমনকি লুঙ্গি, তোয়ালে পর্যন্ত ছোট হয়ে যাচ্ছে। যে তোয়ালে পরে আগে স্নান করে বাথরুম থেকে বেরোতাম, সেই তোয়ালেই এখন নিম্নাঙ্গের অর্ধেক বেড় দিতে পারে না। বম্বের 'চোলি কে পিছে' বা 'শাদি কা বাদ ক্যা হুয়া'র নায়িকাও অনুরূপ পোশাকে বাথরুমের বাইরে বেরোতে সাহস পাবেন না। আমাদের গলির মোড়ে যে দরজির দোকান, সেই দোকান জামাকাপড় অলটার করাতে করাতে সর্বস্বান্ত হওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছি। প্যান্টের ট্রায়াল দেওগার পরে ডেলিভারি নেওগার মধ্যে কোমর ছোট হয়ে যাচ্ছে। দরজি মহোদয় পরম আনন্দে রয়েছেন। যাতায়াতের পথে

মোড়ের দোকান থেকে তিনি আমাকে শকুনির দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেন। আমার এই অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে আমার কৃতবিদ্য প্রবাসী পুত্র গত বছর বাড়ি ফিরে এসে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। পান নয়, পানীয় নয়, শুধু শসা আর শসা, ক্বচিৎ-কদাচিৎ সসাগরা পৃথিবীতে দুটো কড়াশুঁটির দানা আর একটু টমাটোর স্লাইস।

অস্বীকার করা অনুচিত হবে, শ্রীমান কৃত্তিবাস ছয় সপ্তাহে আমার তিন কেজি ওজন কমিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

সেই ছয় সপ্তাহের পরে এর চেয়েও একটা ভয়াবহ কাণ্ড ঘটেছিল। আমার ছেলে তাঁর এক বন্ধু মারফত আমাকে একটি ওজনের যন্ত্র পাঠিয়েছেন, যেটি আমার খাটের নীচে রাখা আছে এবং প্রতিদিন সকালে সেই যন্ত্রারোহণ করে দিন শুরু করি।

অনেক দিন আগে এক ওজনের যন্ত্রের গল্প শুনেছিলাম, যাতে অত্যধিক স্থূল কোনও ব্যক্তি আরোহণ করলে কার্ড বেরিয়ে আসত, 'একে একে আসুন।'

পুত্র-প্রেরিত এই যন্ত্রটি অবশ্য তদনুরূপ নয়। কিন্তু এই যন্ত্রটিতে আরোহণ করলেই আমার একটা তাজ্জব ঘটনা মনে পড়ে।

তখনও ছেলের পাঠানো ওজনের যন্ত্র আসেনি। উত্তর কলকাতার একটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে বিশেষ পরিতৃপ্তি সহকারে কচুরি, রাবড়ি খেয়ে বাইরে বেরিয়ে মনের মধ্যে কেমন একটা ধিক্কার ভাব এল, দেওয়াল-আয়নার মধ্যে নিজের স্ফীতোদরের ছায়া দেখে। সামনেই একটা ওজনের যন্ত্র ছিল, সেই যাতে নীল আলো জ্বলে, লাল চাকা ঘোরে। অনুশোচনাবশত সেই যন্ত্রে একটা আধুলি ঢেলে ওজন নিলাম।

কত ওজন উঠেছিল সে আর না লেখাই ভাল। তবে ওজনের মেশিন থেকে নেমে আসা মাত্র এক ভদ্রলোকের মুখোমুখি হলাম। মোটামুটি ভালই চেহারা, জামাকাপড়ও খুব খারাপ নয়। ভদ্রলোক আমাকে অনুনয় করে বললেন, 'দাদা, পঞ্চাশটা পয়সা দেবেন।'

এ-ধরনের লোক ভিক্ষা করে। এ-রকম খুব বেশি দেখা যায় না। আমি একটু অবাক হয়ে তাকাতে ভদ্র লোক আরও প্রাঞ্জল করে বললেন, 'দাদা, দু'দিন খাইনি, পঞ্চাশটা পয়সা দেবেন।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'দু'দিন খাননি, পঞ্চাশ পয়সার খাবারে আপনার হবে?' ভদ্রলোক বললেন, 'আমি জানি এখন পঞ্চাশ পয়সায় কোনও খাবার হয় না! আমি খাবার কেনার জন্যে পয়সা

চাইনি।'

আমি অতঃপর আরও বেশি অবাক হয়ে বললাম, 'তা হলে আপনি পঞ্চাশ পয়সা কী জন্যে চাইছেন?' করুণ মুখে ভদ্রলোক বললেন, 'এই একটু ওজন নিয়ে দেখতাম ওজন কতটা কমল।'

পুনশ্চ :

হাই পাওয়ারওয়ালা চশমাধারিণী একটি যুবতীর সরকারি চাকরির ডাক্তারি পরীক্ষা হচ্ছিল। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ওজন কত?'

যুবতীটি বলল, 'চশমাসুদ্ধ আমার ওজন সাড়ে সাতচল্লিশ কেজি।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'চশমাসুদ্ধ ব্যাপারটা কী?' যুবতীটি বলল, 'কী করব স্যার? চশমা খুললে যে কিছু দেখতে পাই না, ওজনের যন্ত্রটা পড়তে পারি না।'

নিমন্ত্রণ

নিমন্ত্রণ কথাটার মধ্যে একটা বাজনা আছে, একটা জৌলুস আছে, সেই তুলনায় ইংরেজি 'ইনভিটেশন' শব্দটা খুব সাদামাটা।

জন্মদিন বা বড়দিনের নিমন্ত্রণ আমরা সাহেবদের কাছ থেকে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের নিজেদের নিমন্ত্রণের তালিকাও অতি-দীর্ঘ।

শুধু বিয়ের নিমন্ত্রণের কথাই ধরা যাক, পাকা দেখার নিমন্ত্রণ, আশীর্বাদের নিমন্ত্রণ, গায়ে হলুদের নিমন্ত্রণ, তারপর বিয়ে, বাসি বিয়ে, ফুলশয্যা, বইভাত, অষ্টমঙ্গলা থেকে দ্বিরাগমন পর্যন্ত নিমন্ত্রণের আর শেষ নেই।

একজন সাধারণ বঙ্গজনের কথাই ধরা যাক, তিনি জন্মানোর আগে থেকেই তাঁকে নিয়ে নিমন্ত্রণের সূচনা। মাতৃগর্ভে থাকার সময়েই তাঁর আসন্ন জন্ম নিয়ে সাধের নিমন্ত্রণ। তারপর আটকড়াই থেকে অন্নপ্রাশন, বছর বছর জন্মদিন, বিয়ে, বিবাহবার্ষিকী। এমনকি মৃত্যুর পরে চতুর্থী, ঘাট, শ্রাদ্ধ, মৎস্যমুখী। এবং সেখানেও শেষ নয়, যতদিন না গয়াধামে পিণ্ডদান করা হচ্ছে, বৎসরে বৎসরে বার্ষিক শ্রাদ্ধ। ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। বরং সরাসরি নিমন্ত্রণপত্রে চলে যাই। নিমন্ত্রণপত্র মানে বিয়ের, শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্র। এই

বিয়ের মরসুমে হলুদ এবং সিঁদুর ফোঁটা দেওয়া গোলাপি নিমন্ত্রণ চিঠিতে বাড়িতে বাড়িতে ডাকবাক্স ভরে গেছে। নানা আকারের, রঙবেরঙের সব চিঠি।

কিন্তু এই সব চিঠিরই এক গৎ, বাঁধা বুলি। সেই 'ওঁ প্রজাপতয়ে নম' দিয়ে শুরু আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি নিমন্ত্রণ আইনের উল্লেখ দিয়ে শেষ।

অধিকাংশ বিয়ের-চিঠিতে দুটি বাঁধা বয়ান দেখা যায়, যার সঙ্গে বিয়ের কোনও যোগ বা সম্পর্ক নেই।

প্রথমটি হল ওই অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন বা Guest Control Act. এ বিষয়ে একটি কথা বলার আছে। অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন পালিত হবে, এ কথার অর্থ কী ?

আমি কোনও আইন মান্য করব, এ কথা আমাকে ঘোষণা করতে হবে কেন ? তা হলে তো প্রত্যেককেই গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে ঘুরতে হয়। যাতে লেখা থাকবে,

'আমি চুরি করব না',
'আমি ডাকাতি করব না'
'আমি খুন করব না', ইত্যাদি।

আমি আইন মান্য করে চলব, আইন ভঙ্গ করব না, এ-কথা ঘোষণা করতে হবে কেন ? এটাই তো স্বাভাবিক। এর জন্যে মুদ্রিত নোটিসের কী প্রয়োজন !

নিমন্ত্রণপত্রের আরও কিছু কিছু আনুষঙ্গিক ব্যাপার আছে। সম্ভাষণের কথাই ধরা যাক। শ্রাদ্ধের চিঠিতে 'সময়োচিত নিবেদন', বলা যায়, চলতে পারে। কিন্তু শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের সম্ভাষণ ?

সুকুমার রায়ের হযবরল বইয়ের 'কার্যঞ্চাগে' মনে হলে হাসি পায়। কিন্তু 'যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর' এখনও প্রায় প্রতিটি বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে ব্যবহৃত হয়। নিমন্ত্রণকর্তা বহুক্ষেত্রেই সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। তিনি যে ভেবেচিন্তে এরকম সম্ভাষণ করেন, তা নয়। কিন্তু সবিনয় নিবেদন করতে বাধা কোথায় ?

অবশেষে নিমন্ত্রণপত্রের সবচেয়ে নীচে চলে যাই। যেখানে 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন'...ইত্যাদির নীচে লেখা আছে', 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।'

এই বাঁধা গৎ বা বয়ানটির ব্যাপারটাও গোলমেলে।

আমি এখন পর্যন্ত একটি বাড়ি ছাড়া আর কোথাও দেখিনি উপহার গ্রহণ না করতে। শুধু অনেকদিন আগে দেখেছিলাম এক কন্যাকর্তা

উপহার দেওয়ার সময় কিছু বলেননি, কিন্তু পরের দিন ট্যাক্সি ভাড়া করিয়ে লোক দিয়ে সব উপহার বাসায় বাসায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুটো উপহারের উপহারদাতাকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি। সে দুটো কন্যাকর্তা নিজে গিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এসেছিলেন। আর একটি ব্যাপার শুনেছি। যদিও সেই নিমন্ত্রণপত্রটি আমি স্বচক্ষে দেখিনি। এক পণভারাতুর কন্যার পিতা (একদা কবিতা লিখতেন) নিমন্ত্রণপত্রের শেষে যোগ করেছিলেন,

'নাই খাদ্য, নাই পানীয়,
আসতে পারেন এই শর্তে
লৌকিকতার পরিবর্তে
আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।'

নিমন্ত্রণপত্রের ব্যাপারটা মোটামুটি হল। এবার একটু নিমন্ত্রণ রক্ষার চেষ্টা করি।

নিমন্ত্রণ রক্ষার চেষ্টার গল্পটা খুবই করুণ। অনেকদিন আগে পাটনা শহরে এই ঘটনাটা ঘটেছিল। কী একটা সাহিত্যসভায় আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম। সময়টা বোধহয় মে মাস, রবীন্দ্রজয়ন্তীর কাছাকাছি সময়। পাটনায় পৌঁছেই বিকেলে সাহিত্যসভা। তারপরে সন্ধ্যায় নৈশবাসর, সেখানে প্রচণ্ড হই-হল্লা-ফুর্তি।

সেই হৈ-হল্লার মধ্যে স্থানীয় এক সাহিত্যপ্রেমিক আমাদের অনুরোধ করলেন, পরদিন তাঁর ওখানে মধ্যাহ্নভোজন করতে। যেহেতু আমাদের ফেরার গাড়ি পরদিন রাতে। সুতরাং, আমরা রাজি হয়ে গেলাম। পরের দিন দুপুরে বুঝতে পারলাম, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। খরগ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে পাটনা শহর গন্‌গন্‌ করে জ্বলছে, লু বইছে। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। চারদিক থেকে আগুনের হল্কা আসছে।

কোনও রকমে রিকশ জোগাড় করে অচেনা শহরে অনেক ঘুরপাক খেয়ে নিমন্ত্রণকর্তার গৃহে পৌঁছলাম। তিনি তো আমাদের দেখে অবাক। আমরা খবর পাইনি শুনে, তিনি খুবই খেদ প্রকাশ করলেন, একটু আগেই তিনি আমাদের হোটেলে ফোন করে আমাদের জানতে বলে দিয়েছেন, 'ইনভিটেশন ক্যান্সেল হো গয়া।'

মাছ

'আয়রে আয় ছেলের দল মাছ ধরিতে যাই'—বাংলাভাষার শিশু-ভোলানো ছড়ার জালে ঝলমল করছে নানা বর্ণের, নানা আকারের মাছ। দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে, কারণ ও-পারেতে রুই-কাতলা ভেসে উঠছে। তাতে রুই-কাতলার মতো বড় মাছের কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না ; কিন্তু দাদার কলমটা গেছে। অত বড় মাছ চোখে পড়ার উত্তেজনায় এটা হয়েছে। তা ছাড়া, মাছ ধরেও যে খুব সুবিধে হয়েছে সব সময় তা নয়—সেই একবার তো শুধু ধরা মাছটাই চিলে নিয়ে গেল তাই নয়, মাছ ধরার ছিপটাও নিয়ে গেল কোলাব্যাঙে।

কেবল ছড়ার ছন্দলহরী নয়, আমার বাল্যস্মৃতি ভরে আছে মাছের ঘ্রাণে। সে ঘ্রাণ শুধু কাঁচা মাছের আঁশটে গন্ধের নয়, তার পাশাপাশি রয়েছে সারা বাড়ি উঠোন-অন্দর-বাইরে ভ্রাম্যমাণ মাছ ভাজার বা সাঁতলানোর ভারী সুঘ্রাণ এবং সর্বোপরি মশলা ও মদের গন্ধ-মেশানো মাছের চারের মৌতাত।

আমার ছেলেবেলার পূর্ববঙ্গীয় মফস্বলে মাছকে সীমাবদ্ধ করা উচিত হবে না। 'বাঙালীর জীবনে নারী'র মতই চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ রচনা করা যায় 'বাঙ্গালীর জীবনে মাছ' নাম দিয়ে। আমাদের জীবনচর্চায় মাছ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। মাছ দশাবতারের প্রথম অবতার। পুজো-পার্বণে, আহারে-বাসনে মাছ অপরিহার্য। সরস্বতী পুজোয় যে জোড়া ইলিশকে বরণ করতে হবে তাকেই কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরিয়ে মঙ্গলাচরণ করে বিদায় জানাতে হবে বিজয়া দশমীতে।

অন্নপ্রাশনে ভাতের শিশুর মুখে ছোঁয়াতে হবে এক টুকরো মাছ। ভোজের পাতে নিমন্ত্রিতদের খাওয়াতে হবে অন্তত দু'রকম মাছ—একটা সর্ষেবাটা ঝোল, আর-একটা ঘি-গরমমশলা দিয়ে। তা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে অসুখ সারার পর অন্নপথ্য হবে একটু গলা ভাত আর লেবুর রস দিয়ে কাঁচকলা সেদ্ধ সহযোগে মাগুর বা শিঙি মাছ দিয়ে। মাছ পাঠাতে হবে বিয়ের তত্ত্বে, আশীর্বাদে, পাকা-দেখায়। ঝালে-ঝোলে-চচ্চড়িতে বিয়ের ভোজ হবে জমজমাট। মরার পরেও মাছ ; শ্রাদ্ধ মিটে যাওয়ার পরে মৎস্যমুখী হবিষ্য-উত্তর নিয়মভঙ্গ।

বৈষ্ণব কবিরা নিরামিষ, নিকষিত হেম ছিলেন। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে মাছের ছড়াছড়ি। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বুদ্ধদেব বসু তপসে মাছ থেকে ইলিশ মাছ—বাঙালি কবিরা মাছের জয়জয়কার করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছন্দের নমুনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'পাতলা করে কাটো সখি কাতলা মাছটিরে'। তাঁরই ছড়ায় খেঁদুবাবুর এঁদো পুকুরে মাছ ভেসে ওঠায়, সেই মরা মাছের চচ্চড়িতে পদ্মমণি লঙ্কা ঠেসে দিয়েছিল।

বাংলা সিনেমায় এমন কোনও নায়ক নেই যিনি কোনও-না-কোনও ছবিতে মাছের মুড়ো চিবিয়ে খাননি। এখনও এমন কোনও দিন নেই যে-দিন বাংলা খবরের কাগজে মাছ নিয়ে কোনও সংবাদ থাকে না। সে সংবাদ বাংলাদেশের ইলিশ নিয়েই হোক অথবা সুন্দরবনে গলদা চিংড়ি প্রকল্পের সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে হোক।

মাছ ধরা ভেতো বাঙালির প্রিয়তম শখ। এ-শখ নাগরিক জীবনে তেমন পূরণ হয় না। কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে এমন কোনও বাড়ি খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব, যে-বাড়িতে মাছ ধরার ছিপ নেই। মহানগরেও আছেন অদম্য মৎস্যশিকারিরা, যাঁরা দিনের পর দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা বহুমূল্য একশ টাকার টিকিট কেটে তীর্থের কাকের মতো বসে থাকেন পুকুরের জলে ছিপ ফেলে মাছ ধরার আশায়—যদিও মাছের দেখা মেলে ক্বচিৎ-ক্বদাচিৎ।

এক মিউনিসিপ্যাল পুকুরে বিনা অনুমতিতে মাছ ধরার অপরাধে এক ভদ্রলোক ধরা পড়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেই ভদ্রলোক, যিনি কখনও বঁড়শিতে মাছ ধরতে পারেন না, সে-দিন দুটো ছোট মাছ ধরেছিলেন। অন্যান্য দিন যখন কোনও মাছ তিনি ধরতে পারেন না, তখন লজ্জায় বাজার থেকে দুটো মাছ কিনে নিয়ে যেতেন ; বাসায় গিয়ে বলতেন, ছিপে ধরেছি। তাঁর সহধর্মিণী কিন্তু এই চালাকি ধরে ফেলেছিলেন, ফলত যথারীতি নানারকম গঞ্জনা, টিটকিরি। আজ মিউনিসিপ্যাল পুকুরে ধরা পড়ার পর বিনা অনুমতিতে মাছ শিকার করার অপরাধে তাঁর পঞ্চাশটাকা জরিমানা হল ; অবশ্য শিকার-করা মাছ দুটো তিনি ফেরত পেলেন। আজ হাসিমুখে পঞ্চাশটাকা জরিমানা দিয়ে জরিমানার রসিদ হাতে করে বাড়ি ফিরলেন, দজ্জাল বউকে দেখাবেন, 'এ মাছ ধরা মাছ না কেনা মাছ, এই রসিদ দেখো।'

মাছ শিকারের হাজারো গল্প। সবাই কিছু-কিছু জানে, আমিও অনেক শিখেছি। সবচেয়ে বেশি গল্প—যে মাছ বঁড়শিতে আটকে

ছিল কিন্তু ডাঙায় তোলা যায়নি, তার আগেই পালিয়ে ছিল—সেই মাছ নিয়ে। গল্পে এই সব মাছের আয়তন সাধারণত খুবই বড় হয়। এক ভদ্রলোক তাঁর ছিপ থেকে ছুটে-যাওয়া মাছের দৈর্ঘ্য একেক জনকে একেক রকম দেখাতেন।

এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'কী আর করব ? যে যেমন বিশ্বাস করে তাকে সেইরকম বলি।' অন্য একজন এই সব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার ধারতেন না। তাঁর ছিপের ছুটে-যাওয়া মাছ ক্রমশ বড় হতে লাগল, দেড় হাত থেকে দু'হাত-আড়াই হাত শেষে চার হাতে পৌঁছল।

তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, 'পলাতক মাছটা যে জলের মধ্যে বড় হচ্ছে। যেমন-যেমন বড় হচ্ছে, তেমন-তেমন দেখাচ্ছি।'

জানোয়ার

বহু বছর আগের কথা সে বার কেন যেন আমি একটু বেশি অসুখবিসুখে ভুগছিলাম। তেমন মারাত্মক কিছু নয়, এই একটু জ্বরজাটি, অল্পস্বল্প পেটের গোলমাল। তা হলেও মাঝেমধ্যেই আমাকে দু-চার দিন শয্যাশায়ী থাকতে হত।

সেই সময় আমার এক প্রাণের বন্ধু, আমার অসুখের খবর পেয়ে একদিন আমাকে দেখতে এসেছিলেন। বন্ধুটি সুরসিক। আসার সময় ফুটপাথ থেকে তখনকার দু টাকা দামের একটা চটি বই আমার জন্য কিনে এনেছেন। বইটির নাম, 'সচিত্র পশুচিকিৎসা'। পুস্তিকাটি বন্ধুবর আমাকে উপহার দিয়ে বললেন, 'তোমার যেমন হামেশায় অসুখবিসুখ হচ্ছে, এত ডাক্তার-বৈদ্যের খরচ জোগাবে কোথা থেকে, যাই এই বইটি কিনে নিয়ে এলাম। এখন থেকে নিজের চিকিৎসা নিতে করবে।'

এই অপমানজনক দুঃখের গল্পটি এতদিন পরেও ভুলিনি। পুরনো বই-পত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ ওই 'সচিত্র পশুচিকিৎসা' বইটি হাতে এল। পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। এদিকে এর মধ্যেই একটি সাময়িক পত্রিকায় পশুর অসুখ বিষয়ে সম্প্রতি একটি নিবন্ধ পাঠ করলাম। সেই রচনা পড়ে যা জানলাম সে খুবই চমকপ্রদ।

বানরদের মধ্যে গোষ্ঠিপ্রীতি এবং সামাজিক চেতনা এতই প্রবল যে যদি কোনও কারণে কোনও বানর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, খাদ্য সংগ্রহে অপারগ হয়ে পড়ে, তখন অন্য বানরেরা নিজেরা খাবার না খেয়ে সেই অসুস্থ সঙ্গীকে খাবার জোগায়।

স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুরূপ আচরণ মানুষের কাছে সবসময় আশা করা যায় না। তবে এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, বোধহয় নিরাপদও নয়।

হঠাৎ কোনও একদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে আমরা আবিষ্কার করলাম যে বিছানায় আমাদের লেজ খসে পড়ে রয়েছে। আমরা বানর থেকে মানুষ হয়েছি—ব্যাপারটা ঠিক সে রকম নয়। বানর থেকে মানুষ বনতে আমাদের হাজার লক্ষ বছর লেগেছে। তবু এখনও বানরেরা অনেক সময় মানুষের মতো আচরণও করে। আবার মানুষও বহু সময়ে বানর বা তার থেকে নিকৃষ্টতর পশুর মতো আচরণ করে। শুধু বানরই বা কেন, প্রায় সব জন্তু জানোয়ারের মধ্যে মানুষের মতো কিছু কিছু প্রবণতা দেখা যায়। তাদের আচার-আচরণ আমরা মানুষের মাপকাঠিতেই বিচার করি। সামান্য যে পিঁপড়ে, সেই যে কবি অমিয় চক্রবর্তীর, 'আহা পিঁপড়ে, ছোট পিঁপড়ে ঘুরুক, দেখুক, থাকুক', সেই পিঁপড়েও মানুষের মতোই গোষ্ঠিবদ্ধ জীব। তারও সমাজ সংসার আছে, তারও আচার-ব্যবহার-আচরণ সবই নিয়ম নির্দিষ্ট।

কিন্তু শুধু তাই নয়, সম্প্রতি এক পিঁপড়ে গবেষক জানিয়েছেন যে পিঁপড়েরা ঘুম থেকে উঠে অবিকল মানুষের মতোই আচরণ করে। ঘুম থেকে জেগে উঠে তারা প্রথমে ঠিক আমাদের মতো আড়মোড়া ভাঙে, তারপর হাই তোলে। পিঁপড়ের ঘুমই এক আশ্চর্য, অকল্পনীয় ব্যাপার, তারপর সেই ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙা এবং হাইতোলা—সত্যি ভাবা যায় না।

অতঃপর প্রসঙ্গান্তরে যাই। এই আলোচনায় এই প্রসঙ্গ যথাযথ হচ্ছে না কিন্তু পরে ভুলে যেতে পারি এই আশঙ্কায় পাঠকদের জানিয়ে রাখছি। কেউ কেউ হয়ত পত্রান্তরে খবরটি ইতিমধ্যেই পাঠ করেছেন।

বিষয়টি হল, পশুখাদ্য নিয়ে। এখানে অবশ্য পশু মানে সবরকম জানোয়ার নয়। গবাদি পশু। গবাদি পশুর খাদ্য সমস্যা চিরকালই রয়েছে। বিশেষত খরা অঞ্চলে যেখানে সাধারণ মানুষের খাদ্যই জোটে না, সেখানে আবার পশুখাদ্য ? শুধু খড়ের ওপর নির্ভর করে

চলতে হয়, তাও সহজলভ্য নয়।

সম্প্রতি এ-ব্যাপারে আশার আলো দেখিয়েছেন গুজরাত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বিষয়টি রীতিমতো হাস্যকর হলেও ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিস্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, গবাদি পশুকে কাগজ খাইয়ে তার শরীর ও সাস্থ্য ঠিক রাখা যায়। দৈনিক খাবারের সাতভাগের একভাগ যদি ফেলে দেওয়া, ব্যবহৃত পুরনো কাগজ দেওয়া হয় তাহলে গরুমোষের পক্ষে ওই খাবার হজম করে প্রয়োজনীয় শক্তি বা ক্যালোরি সংগ্রহ করা সম্ভব। ওই গবেষণায় নাকি এটাও জানা গেছে যে ছাপা কাগজ যদি হয় তবে ওই ছাপার কালির জন্যে কাগজের শক্তিমাত্র আরও বেড়ে যায় এবং সেটা গরুদের পক্ষে খুবই উপযোগী।

এ পর্যন্ত বোঝা গেল। কিন্তু গরুরা কাগজ খাবে কিনা, না খেলে তাদের কীভাবে কাগজ খাওয়ানো যাবে, গবেষণাকারীরা সে বিষয়ে কিছুই বলেননি। তবে মুদ্রিত কাগজের আর একটি ভাল ব্যবহার জানা গেল সেটাও কম কথা নয়।

এই জাতীয় গবেষণালব্ধ বক্তব্যে আস্থা রাখা খুব কঠিন। তার চেয়ে একটি কাল্পনিক সরস কাহিনীতে শেষ করি।

বানরের কাণ্ডকারখানাই সবচেয়ে মজার। উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ রোডের এক সিদ্ধির শরবতের দোকানে একবার একটা বানর গিয়েছিল শরবত খাবার জন্যে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যাবেলা, ফুর ফুর করে দক্ষিণের বাতাস বইছে, এমন সময় শরবতের দোকানের সামনের কাঠের বেঞ্চিতে এসে একটি বানর বসল। সেও আরও দশজনের মতো শরবত পান করতে এসেছে। কিন্তু মুখ ভেংচিয়ে, দাঁত-নখ দেখিয়ে দোকানদারকে ভয় পাইয়ে মুফতে শরবত খেতে সে আসেনি।

তার হাতে করকরে একটা দশটাকার নোট। পরপর দু গেলাস ঠাণ্ডা শরবত খাওয়ার পর নোটটা দোকানদারকে দিয়ে সে একটু দাঁড়িয়ে রইল খুচরো পাওয়ার আশায়। তখন দোকানদার বলল, 'ওই পুরো দশটাকাই দাম, একেক গেলাস পাঁচটাকা করে।'

এই শুনে বানরটা ফিরে যাচ্ছিল, তখন দোকানদার বলল, 'দ্যাখো, আরেকটা কথা বলছি, আজ পঁচিশ বছর শরবতের দোকান করেছি, কোনওদিন কোন বানরকে শরবর কিনে খেতে দেখিনি।'

এর জবাবে বানরটা গম্ভীর হয়ে বলল, আর কোনও দিন দেখবেও না। শরবতের যা দাম, বানরদের সাধ্য কী যে শরবত কিনে খাবে?'

তুমি যে আমার

এই নিবন্ধের নাম 'তুমি যে আমার' না হয়ে 'আমি যে তোমার' হলেও কোনও আপত্তির কারণ ছিল না। বলাবাহুল্য, এই কাহিনীমালার উপজীব্য দাম্পত্য জীবন।

সবাই জানেন, ভুক্তভোগীরা ভাল করেই জানেন যে বড়ই বিপজ্জনক এই বিষয় এবং সেই জন্যে অনেকেই আমার দুঃসাহসের তারিফ করেন সে কথা আমার জানা আছে।

এই দুঃসাহসিক গল্পকথা শুরু করা যাক দুটো নৈশ কাহিনী দিয়ে। দুটি কাহিনীই প্রায় একরকম, শুধু শেষের দিকে একটু ব্যতিক্রম।

মধ্যরাত অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। মহানগরীর নির্জন রাস্তায় এক ব্যক্তি ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ, যেমন হয়, তার পথ আটকিয়ে দাঁড়াল এক মূর্তিমান পুলিশ। তারপর সেই পুলিশ লোকটিকে কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ও হে, এই এত রাতে কোথায় যাচ্ছ।' সহসা পুলিশ দেখে লোকটি একটু চমকিয়ে গিয়েছিল। অল্প পরে ধাতস্থ হয়ে সে পুলিসকে জানাল, 'জমাদারসাহেব, একটা বক্তৃতা শুনতে যাচ্ছি।'

জমাদারসাহেব ঘাগু লোক, এত সহজে ছাড়বার লোক তিনি নন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়ার্কি নাকি? এত রাতে বক্তৃতা হবে কোথায়?'

লোকটি জবাব দিল, 'হুজুর, আমার বাড়িতে।' জমাদার সাহেব ধমকিয়ে উঠলেন, 'তোমার আবার কীসের বক্তৃতা? কে বক্তৃতা করবে?'

লোকটি করজোড়ে বলল, 'হুজুর আমার স্ত্রী বক্তৃতা করবেন। বিশ্বাস না হয় তো দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন। প্রতিদিনই এরকম হয়, দেরি করে বাড়ি ফেরার বিষয়ে প্রতি রাতেই আমার স্ত্রী এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করেন।'

পরের কাহিনীটি এই একই। ওই মধ্যরাত, মহানগরীর নির্জন রাজপথে একাকী পথিক জমাদারসাহেবের মুখোমুখি। তবে এই গল্পের জমাদারসাহেব অল্প কিছুক্ষণ আগে গাঁজাপার্কে বসে কয়েক ছিলিম গাঁজা টেনে এসেছেন, ফলত, তাঁর মন এখন কিছুটা ব্যায়বীয়, তাঁর হৃদয় বেশ আপ্লুত। তিনি মধ্যরজনীর পথিককে বিশাল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে সস্নেহে বললেন, 'বাবা, এত রাতে রাস্তায়

ঘুরছ, ঘরে কি তোমার বউ নেই ? সে যে রাগ করবে।'

নৈশ পথিক বললেন, 'স্যার ঠিকই ধরেছেন, আমি বিয়ে করিনি, ঘরে আমার বউ নেই।' জমাদার সাহেব অতঃপর পথিককে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, ঝরঝর করে তাঁর চোখের জলের ফোঁটা হতভাগ্য নৈশভ্রমণকারীর চোখ মুখ গাল মাথা ভিজিয়ে দিল। সেই সঙ্গে ফ্যাঁসফেঁসে গেঁজেল কণ্ঠে জমাদার সাহেব জিঞ্ঞাসা করলেন, 'বাবা তুমি যদি বিয়ে না করে থাক, ঘরে যদি তোমার বউ না থাকে, তবে কীসের দুঃখে তুমি এত রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছ ?'

অতঃপর এক হতভাগ্য স্বামীর কথা বলি। বেচারার নতুন বিয়ে হয়েছে। নবপরিণীতা পত্নী খুব আহ্লাদ করে এই প্রথম মাংস রান্না করেছে।

স্বামীর থালায় মাংস তুলে দিয়ে নবীনা স্ত্রী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'ওগো, একটু চেখে বলো তো এই মাংসটা কেমন রান্না করেছি।' তারপর একটু থেমে বলল, 'জানো আজ আমি প্রথম মাংস রান্না করলাম।

একটু মুখে দিয়ে স্বামীর কেমন খটকা লাগল, কেমন অদ্ভুত একটা স্বাদ, স্ত্রীকে সে কথা জানাতে স্ত্রী বলল, 'ও কিছু নয় বার্নল দিয়েছি কি না তাই।' স্বমী স্তম্ভিতহয়ে বলল, 'বার্নল' দিয়ে মাংস রান্না করেছ ?' স্ত্রী বলল, 'মাংসটা একটু পুড়ে গিয়েছিল কিনা তাই বার্নল লাগিয়ে দিলাম।' অবশেষে এই নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করা উচিত হবে কিনা এই ভেবে এতক্ষণে এই ঘটনাটা লিখছি। দয়া করে কেউ অবিশ্বাস করো না, বড়ই সত্য ঘটনা। আমার অফিসেই ঘটেছিল।

প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার ব্যাপারে কর্মচারীদের একটি নমিনেশন ফর্ম দিতে হয়, যাতে লিখতে হয় যে এই ব্যক্তিকে আমি মনোনয়ন করলাম আমার অবর্তমানে, (অর্থাৎ মৃত্যু হলে) ইনি এই টাকাটা পাবেন। তারপরে লিখতে হয় যাঁকে মনোনয়ন করা হল তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক কী।

সবাই এ-সব ক্ষেত্রে স্ত্রী কিংবা পুত্রকে মনোনয়ন করেন, অবিবাহিতেরা মাকে মনোনয়ন করেন। নির্দিষ্ট ফর্মে প্রথমে নিজের নাম, তারপরে মনোনীতজনের নাম এবং তাঁর সঙ্গে কী সম্পর্ক অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র বা মা লেখা হয়।

এইরকম একটি ফর্মে একবার দেখেছিলাম এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে মনোনীত করেছেন, স্ত্রীর নাম ঠিকই লিখেছেন কিন্তু ঠিক তার পরের ঘরে সম্পর্কের জায়গায় লিখেছেন, 'খুব খারাপ সম্পর্ক, মোটেই

বনিবনা নেই। এ-কথা তিনি বুঝে লিখেছিলেন, নাকি না বুঝে সেটা কিন্তু জানতে পারিনি।

পুনশ্চ : স্থূলাঙ্গিনী স্ত্রীকে ডাক্তারখানা থেকে ফিরে এসে বললেন, 'ওগো রোগা হওয়ার ট্যাবলেট তো তুমি অনেক খেলে, কিন্তু কিছুতেই তো কিছু হল না। এবার তোমাকে ডাক্তারবাবু এই ট্যাবলেটগুলো দিয়েছেন, এগুলো কিন্তু খাওয়ার জন্যে নয়।' এই বলে স্বামী পঁচিশটা গোল আকারের ট্যাবলেটের একটা শিশি স্ত্রীর হাতে দিলেন। স্ত্রী বললেন, 'তা হলে এই ট্যাবলেটগুলো কী কাজে লাগবে?' স্বামী বললেন, 'ডাক্তারবাবু বলেছেন, দিনে তিনবার এই ট্যাবলেটগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে দিতে, তারপর সেগুলো গুনে গুনে কুড়িয়ে শিশিতে তুলে নেবে। দ্যাখো এতে যদি রোগা হওয়া যায়।'

স্ত্রী রত্ন

স্ত্রী রত্ন বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে অনেক লিখেছি। আরও একবার লেখার সময় এবারে সংস্কৃত শ্লোকের কিছুটা আশ্রয় নিচ্ছি।

প্রথমে এই নারীমুক্তির যুগে এসই প্রতিক্রিয়াশীল শ্লোকটি স্মরণ করছি, যার শেষ কথা হল 'স্ত্রিয়া নাস্তি স্বতন্ত্রতা।'

এর মানে হল স্ত্রীলোকের কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই। একটি নাটকের দৌলতে বাঙালি মাত্রেই পুরো বয়ানটি জানেন, যেখানে বলা হয়েছে, বাল্যকালে পিতা রক্ষা করেন, স্বামী মানে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে, আর পুত্র রক্ষা করেন বৃদ্ধ বা স্থবিরকালে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আধুনিক বাংলায় ভদ্রসমাজে ভাতার শব্দটি চলে না, একটু নোংরা ও গ্রাম্য মনে হয়। কিন্তু শব্দটি সরাসরি এসেছে ওই সংস্কৃত ভর্তা থেকে। ভর্তা শব্দের অর্থ হল স্বামী বা পতি, যিনি ভরণ করেন অর্থাৎ ভরণপোষণ করেন।

ঋগ্বেদীয় বিবাহমন্ত্রের সরাসরি অনুসরণ করে স্বামীর এই সংজ্ঞা, ভর্তা বা ভাতার, কিন্তু তিনি তো বিবাহোত্তর জীবনে এবং তাঁর জীবদ্দশায় স্ত্রীর ভর্তা তার আগে সেই মেয়ের ভরণপোষণ করেছেন, তাকে রক্ষা করেছেন তাঁর বাবা এবং পরে একই দায়িত্ব বর্তেছে তাঁর সন্তানের ওপর। এখানে অবশ্য সন্তান বলতে পুত্রসন্তান।

সে যা হোক, এই শ্লোক অনুসারে স্ত্রীলোকের কোনও বয়সেই কখনও কোনও স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য নেই। কখনও সে পিতার অধীন, কখনও স্বামীর, কখনও পুত্রের।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'দুলিয়ে বেণী চলেন যিনি
এই আধুনিক বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তাঁর ছবি।'

বলা বাহুল্য, এখানে মহাকবি হলেন কালিদাস। রবীন্দ্রনাথ, বাঙালির বিশ্বকবি, চেয়েছিলেন মহাকবির কালে জন্মাতে, যাদের সঙ্গে হয়নি মিলন, সে-সব বরাঙ্গনার বিচ্ছেদের দুঃখে সামিল হতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এখন আমাদের সমস্যা রবীন্দ্রনাথ বা কালিদাস বিশ্বকবি বা মহাকবিকে নিয়ে নয়। আমাদের সমস্যা ওই সংস্কৃত শ্লোককারকে নিয়ে, যাঁর কল্পনাতে 'দুলিয়ে বেণী চলেন যিনি এই আধুনিক বিনোদিনী' ছিল না। কিন্তু শুধু আধুনিকা, আন্দোলিত বেশী বিনোদিনীর কথা নয় ; কলে-কারখানায়, অফিস-কাছারিতে, জীবনের সর্বত্র মহিলারা এ-যুগে স্বাধীনভাবে পুরুষদের মতোই নানা ক্ষণ নানা কর্মে রত। এঁদের কথা সংস্কৃত শ্লোককার বোধহয় স্বপ্নেও অনুমান করতে পারেননি। এবং তাঁরই দোসর অন্য এক শ্লোককার একই রকম ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী'।

স্ত্রীঘটিত বিষয়ে আলোচনা এত নীরস হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু ভুল করে ওই সংস্কৃত শ্লোকের ফাঁদে পড়ে গোলমাল হয়ে গেল।

এবার পাপস্খলনের চেষ্টা করি।

প্রথমে সেই ফাজিল ভদ্রলোককে স্মরণ করি, যাঁকে তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, 'আমি বোকা, বেকুব, তাই তোমাকে বিয়ে করেছিলাম।' এক জবাবে সেই ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'দেখ, বিয়ের আগে তোমার প্রেমে আমি এতই অন্ধ ছিলাম যে তোমার ওই ব্যাপারটা আমার চোখে ধরা পড়েনি।'

যতদূর শুনেছি, ওই ভদ্রমহিলাই একবার স্বামীর কাছে নালিশ করেছিলেন, 'আমি নীরবে, মুখ বুজে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তোমাদের সংসারের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা সহ্য করে যাচ্ছি।' এর উত্তরে নাকি সেই ফাজিল স্বামী বলেছিলেন, 'কী বললে ? নীরবে ? তাহলে ফোনের এত বিল ওঠে কী করে ?'

সব স্বামী অবশ্য এত চৌকশ হয় না। অনেকে বউকে সব কথার জবাব দিতে পারে না।

তাদের জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। বরং চৌকশ স্বামীর কথা আর একটু বলি। কেনাকাটা করতে যাবেন বলে ভদ্রমহিলা স্বামীর কাছে কিছু টাকা চেয়েছেন। স্বামী চুপ করে বসে আছেন। তখন স্ত্রী ফিরিস্তি দিতে শুরু করলেন একের পর এক।

'আমার একটা আলমারি আছে। তাতে কোনও শাড়ি নেই।'

'আমার একটা আতরদানি আছে। তাতে এক ফোঁটা আতর নেই।'...

'আমার একটা গয়নার বাক্স রয়েছে। তার মধ্যে কোনও গয়না নেই।'...

'আমার একটা সুর্মার শিশি আছে। তার মধ্যে কোনও সুর্মা নেই।'...

এইরকম দীর্ঘ তালিকা। ভদ্রমহিলার ফিরিস্তি শেষ হতে স্বামী ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, একেবারে সার কথাটি বললেন, 'আমার একটা মানিব্যাগ আছে, তাতে কোনও টাকা নেই।'

পুনশ্চ :

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ক্লাবঘরে এসে গলার টাইটা ঢিলে করে দিয়ে আয়েশ করে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে নবকুমার সবাইকে শুনিয়ে বললেন, 'আজ থেকে শ্রীমান জগমোহনের দুর্ভাগ্যের শুরু।'

ক্লাবের সদস্যরা সবাই জানেন জগমোহন আর নবকুমারের দীর্ঘদিনের রেষারেষি, সুতরাং এ-কথা শোনার পর কেউ কেউ নবকুমারের কাছে জানতে চাইল, 'কেন, জগমোহনের কী হল?' নবকুমার মৃদু হেসে বললেন, 'জগমোহন আমার বউকে নিয়ে পালিয়েছে।'

সৈয়দ মুজতবা আলী

অনেকদিন পরে এবার একজন জ্যান্ত মানুষের কথায় আসছি, সৈয়দ মুজতবা আলী।

আমার এই অল্পবেশি চারদশকের সাহিত্যজীবনে কত উত্থানপতন দেখলাম। কত দিগ্বিজয়ী লেখককে ঘোড়া থেকে ছিটকিয়ে মুখ থুবড়িয়ে পড়তে দেখলাম। ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছিল যে লেখককে, মৃত্যুর দু' বছর পরে তাঁর আর কোনও পাত্তা নেই। তাঁর বইয়ের বিজ্ঞাপন নেই, তাঁর রচনায় আলোচনা নেই, থাকলেও দায়সারা। দোকানের শো-কেসে তাঁর বই নেই। শৌখিন পাঠিকার বালিশের নীচে কেশতেলে সিক্ত সেই পুরনো পত্রিকা আছে কিন্তু তাতে তাঁর কোনও কথা নেই।

বেশি বলে লাভ নেই। মোদ্দা ব্যাপার হল, জীবদ্দশায় অতি বিখ্যাত, অতি জনপ্রিয় অনেক লেখকই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মরে যান। দু-চার দিন ওই শ্রাদ্ধশান্তি, নিয়মভঙ্গ পর্যন্ত টিকে থাকেন। তারপর কানা মাছি ভোঁ-ভোঁ কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে মুজতবা বেঁচে রয়েছেন। এখনও তাঁর বই, গ্রন্থাবলী প্রকাশক ছাপেন। লোকে কেনে লোকে পড়ে। 'কোরক' নামে একটি সাহিত্য-পত্রিকা এই বইমেলায় সৈয়দ মুজতবা আলীর ওপরে একটি সংখ্যা বার করেছেন। প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার রীতিমতো গ্রহণযোগ্য সঙ্কলন।

'শেষমেশ' নামক এই তরল নিবন্ধমালায় পুস্তক বা পত্রিকা সমালোচনার সুযোগ নেই। আমরা সে ব্যাপারে যাচ্ছি না। সৈয়দ মুজতবা আলীর অতি বিখ্যাত, অতি পরিচিত সরস কবিতা কথিকাগুলি পুনরুদ্ধার করারও কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সেই সব রসিকতার আখ্যান বাঙালি পাঠকের খুবই পরিচিত।

কোরকের এই মুজতবা সংখ্যায় আমি মুজতবা সাহেবের কয়েকটি অলিখিত রসিকতার সন্ধান পেলাম, তাঁর চিঠি বা আলাপচারিতা থেকে এইগুলি উৎকলিত। বলাবাহুল্য, মুজতবা-বাক্যের কোনও তুলনা নেই। শেষমেশের পাঠক-পাঠিকারা একবার দেখুন।

বিশিষ্ট চর্মরোগ চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞ ডাঃ মহম্মদ আব্দুল ওয়ালীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল সৈয়দ মজুতবা আলীর।

ডাক্তার ওয়ালী এক বৃষ্টির দিনের গল্প বলেছেন। সকালবেলা প্রতিবেশী এক বন্ধুর বাড়িতে চা-পানের আসর বসেছে। সে আসরের

মধ্যমণি, বলা বাহুল্য, সৈয়দ মুজতবা আলী। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, এমন সময় মুজতবা উঠে দাঁড়ালেন আরামকেদারা ছেড়ে একবার নিজের বাসায় যাবেন, সেখান থেকে কী একটা দরকারি বই নিয়ে আসবেন। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। সবাই হাঁহাঁ করে উঠল। 'যাবেন না, যাবেন না। বাইরে বেরবেন না।'

মুজতবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন' ? সবাই বলল, 'দেখছেন না বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির জলে ভিজে যাবেন যে।' শুনে মুজতবা হেসে বললেন, 'আমি মিছরি না চিনি ? ভিজলে কি আমি গলে যাব।'

অল্পক্ষণ পরে নিজের বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় বইটি হাতে নিয়ে মুজতবা ফিরে এলেন। তারপর হাহতে হাসতে সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি জানো যে ইহুদিরা ছাতা কেনে না।' সবাই বলল, 'না, এরকম কথা তো আমরা কখনও শুনিনি।' মুজতবা বললেন, 'না, এরকম কথা তো আমরা কখনও শুনিনি।' মুজতবা বললেন, 'না শুনে থাকো তাতে কিছু আসে যায় না। তবে কারণটা জানতে চাও কি ?' সবাই জিজ্ঞাসা করল, 'কী কারণ ?' মুজতবা বললেন, 'ইহুদিরা এতই বুদ্ধিমান ও হিসেবি যে তারা বৃষ্টির ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে হাঁটতে পারে, তাই বৃষ্টির মধ্যে হাঁটলেও তারা ভেজে না।'

আরেকবার প্রাণীবিজ্ঞানের এক নবীন অধ্যাপক ও গবেষককে নিয়ে ওয়াল সাহেব মুজতবা আলীর কাছে গেছেন। তাকে দেখে বক্রদৃষ্টিতে তিনি শুধালেন, 'হঠাৎ এখানে এসে হাজির কেন ?' ওয়ালী সাহেব বললেন, 'আপনার ভক্ত। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহে এসেছে।' মুজতবা আলী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'না। না। না। আসল মতলবটা হল এই চ্যাংড়া অধ্যাপকের রিসার্চ সেক্টরে জন্তু-জানোয়ারের নিশ্চয় কিছু অভাব ঘটেছে। তাই আমাকে দেখতে এসেছে। পছন্দ হয় কি না।'

সৈয়দ মজুতবা আলী সম্পর্কে আর একটি মারাত্মক গল্প লিখেছেন ওয়ালীসাহেব। সৈয়দ মুজতবা আলী অতিথিবৎসল ভদ্রলোক ছিলেন। একবার সপরিবারে ওয়ালীসাহেবকে তিনি নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর রাতে মুজতবা সাহেব বেশ কিছুটা পথ অতিথিদের এগিয়ে দিয়ে এলেন। অনেকটা পথ এগিয়ে দেওয়ার পরে স্বাভাবিক সৌজন্যবশত ওয়ালীসাহেব আপত্তি জানালেন, 'অনেকটা পথ এসে গেলেন, আপনি আর এগোবেন না।' কিন্তু মুজতবা আলী আরও অনেকটা পথ তাঁদের এগিয়ে দিলেন। শেষপর্যন্ত ফিরে আসার সময় বললেন, 'আমি আমার বন্ধুদের ঠিক

সেই পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যাই যেখানে থেকে তাদের ফিরে আসার আর কোনও সম্ভাবনা থাকে না।'

পুনশ্চ :

শেষ কাহিনীটি শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্তের। এই 'কোরক' কাগজেই তাঁর সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে 'কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি' প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত গুপ্ত মুজতবার 'দেশে বিদেশে' বইটির একটি রিভিউ করেছিলেন। সেটি পড়ে মুজতবা রাধাপ্রসাদবাবুকে এক কপি ওই বই 'দেশে বিদেশে' পাঠিয়ে দেন এবং সেই সঙ্গে লেখেন, 'শাঁটুল মামু, (রাধাপ্রসাদের ডাকনাম শাঁটুল) তুমি আমার বইয়ের যে রকম বেশরম প্রশংসা করেছ তা থেকে পরিষ্কার মালুম হচ্ছে তুমি আমার লেখাটা পড়োনি। যাতে ভাল করে পড়তে পারো সেজন্য এই বইটা দিলাম।'